অসহযোগ ব্রতারম্ভের প্রারম্ভে
দেশবন্ধু, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি—মর্ত্ত্যের অমরাবতী। বিধাতা যেমন তিল তিল সৌন্দর্য্য লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি জগতের যাবতীয় রত্ন-সম্ভার লইয়া এই ভারতবর্ষকে রচনা করিয়াছেন, এমন নৈসর্গিক শোভা সম্পদ পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। কোন দেশেই ভারতবর্ষের ন্যায় ষড়্ঋতু পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া নানা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে দেশকে পরিশোভিত করে না। যুগে যুগে এই ভারতে কত ত্যাগী, কত মুমুক্ষু সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া রাজ্যৈশ্বর্য্য ধূলিকণার ন্যায় পরিত্যাগ ও রাজপ্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এ দেশের কত শত রাজকুমার বিজন অরণ্যে গিয়া জীবের মুক্তির জন্য কঠোর তপঃ জপঃ সাধনা করিয়াছেন, ভারতের তপোবন, গিরিকন্দর, নদীতট আজিও সে স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৌতম বুদ্ধ জীবের আধিব্যাধি জরা দেখিয়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্য রাজ্যধন নিষ্ঠীবনের মত পরিবর্জ্জন করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে করুণার পূতবাণী প্রচার করিয়া-

শেষ দেখা—দেশবন্ধুর বাসভবনের সম্মুখে
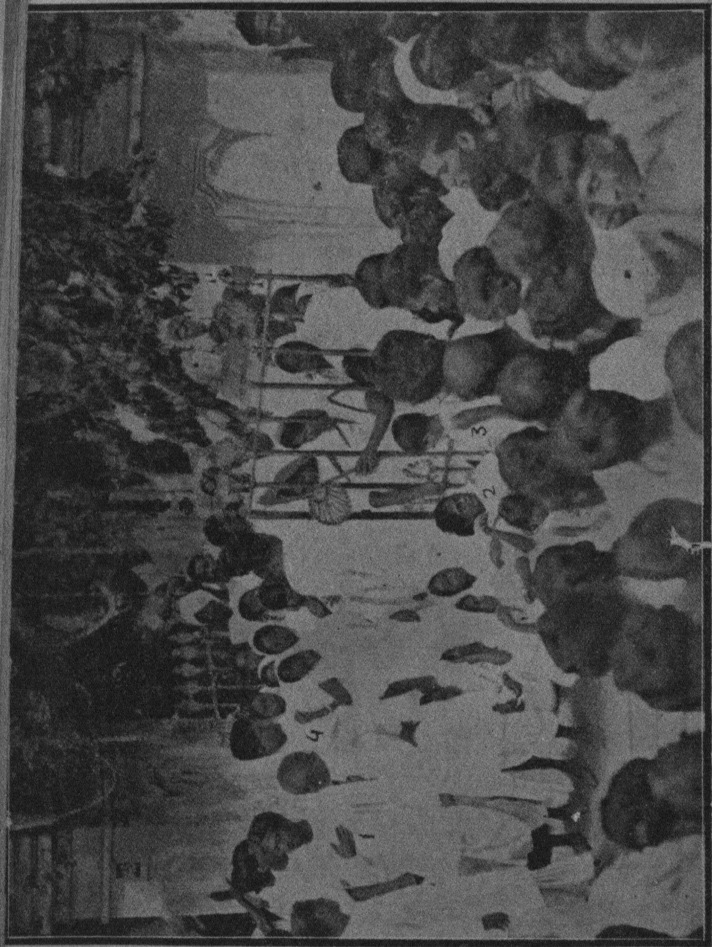
(১) দেশবন্ধুর ভ্রাতা মি: পি, আর দাশ, (২) শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী (৩) দেশবন্ধুর দৌহিত্র (৪) দেশবন্ধুর জা[illegible]তা শ্রীযুক্ত সুধীর রায়।

ছিলেন। তপস্থার কুলিশ কঠোর নির্ম্মম ক্লেশ তাঁহাকে একদিনের জন্যও সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। নদীয়ায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দ্বারে দ্বারে প্রেম ধর্ম্ম বিলাইবার্ জন্য অনিন্দ্যসুন্দরী সহধর্ম্মিণীর মোহ-পাশ ছিন্নবিছিন্ন করিয়া কৌপীনবাসে কটিতট আচ্ছাদিত করিয়া ভারতের দ্বারে দ্বারে হরিনামামৃত প্রেমসুধা বিতরণ করিয়াছিলেন, তান্ত্রিকের রক্তচক্ষু, শাণিত খড়্গ কিংবা নবাবের অমানুষিক লাঞ্ছনা তাঁহাকে একদিনের জন্যও সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পাবে নাই। উনবিংশতি শতাব্দীতে রজতধারা প্রবাহিণী সুরধুনী তটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রচার করিয়া বিরাট সনাতন বৈদিক ধর্ম্মকে জগতের উপভোগ্য করিয়া তুলিলেন, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রভাবিত সমাজ তাঁহার সাধু কর্ম্মের অবাধ নির্ঝরিণীকে প্রহত, ব্যাহত করিতে পারিল না। তাঁহার সার্ব্বভৌম, অত্যুদার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যুগাবতার প্রথমজীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভায় প্রভান্বিত ও শিক্ষিত মনীষী বিবেকানন্দ প্রতীচির ললাটে ভারতের শাশ্বত বাণী অক্ষয় অক্ষরে খোদিত করিলেন। তাঁহার বিজয় ভৈরবনাদে হিন্দুসমাজ সঙ্কীর্ণতার তমিস্রা ভেদ করিয়া নব উদ্দীপনার সঞ্জীবনী স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়া মানুষকে নর-নারায়ণ রূপে দেখিতে শিখিল। তারপর অকস্মাৎ ভাস্বর জ্যোতিষ্কের মত মহাত্মা গান্ধী ভারতের প্রাচী-ললাটে আবির্ভূত হইয়া জগতে যাহা কেহ কোনদিন কল্পনাও করে নাই, সেই নূতন বাণী—"অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয়" বাণী উচ্চারণ করিয়া জগতে সাম্য মৈত্রীর বিজয় জয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। সেই সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার বিষাণ-ধ্বনি শুনিয়া রাজার ন্যায় অগাধ ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ

করিয়া বুদ্ধ চৈতন্যের ন্যায় এক মহাপুরুষ জাতির মুক্তি কামনায় আত্মোৎসর্গ করেন। তিনিই বিংশশতাব্দীর শেষ যুগাবতার, বিশ্ব-প্রেমিক, স্বাধীনতার অগ্রদূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে জানিতে ও চিনিতে হইলে তাঁহাব ন্যায় দেশাত্ম-বোধেব ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। আমার দেশ, আমার জাতি, আমি আমার দেশের মুক্তি চাই, জাতির কল্যাণ চাই, আমার দেশের যাহা কিছু সকলই উত্তম, এই আমার আমার—আমি আমি ভাবে অনু-প্রাণিত না হইলে চিত্তরঞ্জনকে বুঝিতে ও চিনিতে পারা যাইবে না। চিত্তরঞ্জন কে? চিত্তরঞ্জন ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডীর জলন্ত সাহস, নেপো-লিয়নের বীরত্ব, ওয়াশিংটনের প্রতিভা, শ্রীচৈতন্যের আত্মা, বুদ্ধের তপস্যা হরিশ্চন্দ্রের দান লইয়া এই বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মানুষের প্রাণের মধ্যে দেশেব জন্য সত্য আকুলতা না আসিলে মানুষ কি ওরূপ-ভাবে রাজভোগ ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে পারে? দেশবন্ধু দেশাত্মবোধের সত্যিকার প্রেরণা পাইয়াছিলেন; সে প্রেরণা তাঁহার জন্মগত—মন্দাকিনী ধারার ন্যায় বংশানুক্রমে সে প্রেরণার ধারা অবিরাম গতিতে পিতৃপিতামহের আত্মা হইতে তাঁহার আত্মায় প্রভাবিত হইয়াছিল। দেশবন্ধুর বংশানুক্রম আলোচনা করিলে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জন্মভূমি

যে গৌড় দেশ এক সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, যে গৌড় দেশ এক সময় হিন্দুজাতির গৌরবের, শ্লাঘার, স্পর্দ্ধার স্থান ছিল, হিন্দুজাতির স্বাধীনতা স্পৃহা যে গৌড়ের জলবায়ুতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, চিত্তরঞ্জনের পিতৃ-পিতামহগণ সেই গৌড় দেশের, দুকূল-প্লাবনী, অতলস্পর্শী পদ্মার তীরে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই পদ্মার তীর প্রকৃতির লীলা-ভূমি। এখানকার সায়ং-সৌন্দর্য্য নিতান্ত নির্জীবের প্রাণেও কবিত্ব উৎস ঢালিয়া দেয়। চিত্তরঞ্জনের পিতৃ-পিতামহ এই পদ্মার তীরে জন্মগ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জনের পিতৃভূমি বিক্রমপুরে হইলেও তিনি ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় পটলডাঙ্গার একটি বাড়ীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যে দিন চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয় সে দিন বোধ হয় ভারতমাতার আনন্দে অঙ্গস্পন্দন হইয়াছিল—বুঝি বা সেদিন অলক্ষিতে ভারত-জননী মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। যুগে যুগে ভারতে যত মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্মের সময়ে দেখা যায় নৈসর্গিক শোভা সম্পদের পরিবর্ত্তন হয়। প্রকৃতি যেন নব বসন্তের আগমনে নব শোভা সম্পদে সুসজ্জিত হইয়া উঠে। বোধ হয় চিত্তরঞ্জনের জন্ম সময়েও প্রকৃতির এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

চিত্তরঞ্জনের পিতৃভূমি বিক্রমপুর পরগণার আড়িয়াল বিলের পার্শ্বস্থিত তেলির বাগ নামক গ্রাম। চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যত্র হইতে ইদানীং এখানে আসিয়াই বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। জাতিতে তিনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দাশ বংশের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন বঙ্গের শাসনকর্ত্তাও ছিলেন। মহত্ত্ব, ঔদার্য্য ও সৎ সাহসের জন্য তাঁহারা তৎকালীক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতা ৺ভুবনমোহন দাশ কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি হাইকোর্টে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৺ ভুবনমোহন প্রথমে "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" ও পরে "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রের সম্পাদকতা করেন। এই দুই পত্রের সম্পাদকতা করিয়া ভুবনমোহন তদানীন্তন সংবাদপত্র সম্পাদক মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ছিলেন, আচারে ব্যবহারে তিনি উন্নতিশীল ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। অথচ তখনকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতা এরূপভাবে হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে প্রকাশ হয় নাই। ব্রাহ্মণসন্তান তখন ব্রাহ্মণ্য জীবনের আদর্শ চতুরাশ্রম প্রতিপালন করিতেন। টোল চতুষ্পাঠী তখন বাঙ্গালার অনেকস্থানে বিদ্যমান ছিল। একখানি ধুতি পরিয়া গামছা কাঁধে করিয়া লোকে তখন বড় বড় সমাজে সামাজিকতা রক্ষা করিতেন। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য তখন বিদেশে এরূপভাবে রপ্তানী না হওয়ায় দেশে খাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না, পক্ষান্তরে বিদেশী বিলাসসম্ভার অজস্র ভাবে এ দেশে আমদানী না হওয়ায় দেশবাসী যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তৎসমস্ত আপন ঘরেই রাখিতে সমর্থ হইত। অভাব তখনও দেশবাসীর ছিল

সত্য, কিন্তু অভাবের বৃশ্চিক দংশনে দেশবাসী এমনভাবে জর্জ্জরিত হইত না। ভারতের বক্ষে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা যখন এদেশের চিরন্তন প্রথার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল—পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন ধীরে ধীরে এ দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল, প্রাচ্য-প্রতীচি সভ্যতার সেই সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণে ভুবন-মোহন বিদ্যমান ছিলেন। ভুবনমোহন ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও ব্যুৎপন্ন হইলেও পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত জীবনযাত্রার প্রণালী তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। পিতৃ-পিতামহের ন্যায় তিনিও যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন অকাতরে দুঃস্থদিগের জন্য তাহা সমস্তই দান করিতেন। প্রার্থী কখনও বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইত না। তিনি এক হস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, অন্য হস্তে তাহা দান করিতেন। অনেক সময় অন্যের নিকট হইতে ঋণ করিয়া পর্য্যন্ত তিনি অপরকে দান করিতেন। কেহ নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ মুখে তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইবে এ চিন্তা মনেও স্থান দিতে তিনি কষ্ট বোধ করিতেন। ধীরে ধীরে তিনি ঋণগ্রস্ত হইতেছেন, জমার ঘরে শূন্য পড়িতেছে, ভুবনমোহনের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। যে কেহ অভাব জানাইয়া তাঁহার নিকট আসিতেছে তাঁহাকেই তিনি সাহায্য করিতেছেন। দরিদ্রের রক্ষক—বন্ধু বান্ধবের পালক—দীনবন্ধু ভুবন-মোহন দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইয়াও দরিদ্র-সেবার মহামন্ত্র ভুলেন নাই। শেষে ঋণ-সাগরে যখন তিনি আকণ্ঠ ডুবিয়া গেলেন, চারিদিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় উত্তমর্ণগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন ভুবনমোহন ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে দেউলিয়া

আদালতের (Insolvency Court) শরণাগত হইলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর যেরূপ দানশীল ছিলেন তাহাতে তৎপুত্র ভুবনমোহনের দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্রতার বিষয় নহে। শুনা যায়, চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহা নিজের গ্রামের অতিথিশালায় অসহায় পথিকগণের আতিথেয়তার জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি অতিথিশালার জন্য যে টাকা ব্যয় করিতেছেন তাহা যথার্থরূপে অতিথি সেবার জন্য ব্যয়িত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য একদিন দুপুর রাত্রে তিনি নৌকা করিয়া ছদ্মবেশে গ্রামের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইয়া অতিথিশালায় সংবাদ পাঠাইলেন যে, একজন অতিথি আজিকার রাত্রের জন্য অতিথিশালায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর রজনী, সেই রজনীতে—কর্ম্মচারীরা কোনমতে তাঁহাকে অতিথিশালায় স্থান দিল না, এবং এমন কি কেহ অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর হইল না। কাশীশ্বরবাবু কর্ম্মচারীদের ঈদৃশ ব্যবহারে তখন কোন প্রকার আত্ম-পরিচয় না দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন কর্ম্মচারীদিগকে ডাকাইয়া ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন। অতিথি-সৎকারের জন্য কাশীশ্বরের এইরূপ ঐকান্তিকী আগ্রহ ছিল। এহেন কাশীশ্বরের পুত্র ভুবনমোহন যে অতিরিক্ত বদান্যতার ফলে দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হইবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

যেমন বীজ তদনুরূপ অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। আবার যেমন বৃক্ষ তাহাতে তদনুরূপ ফল ফলিয়া থাকে। পিতা পিতামহ যে যে গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন, সন্তানও অধিকাংশস্থলে তত্তৎগুণের

অধিকারী হয়, ইহা প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। পিতামাতার গুণাগুণ সন্তানে পরিস্ফুট হয়, এ দৃষ্টান্ত বিরল ত নহেই বরং বিজ্ঞান সম্মত। চিত্তরঞ্জন যে অগাধ দানশৌণ্ডিকতার নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন—যে বিরাট ত্যাগের দ্বারা দেশকে নব আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহার মূলে আমরা চিত্তরঞ্জনের পিতৃ-পিতামহের বদান্যতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। আবার "সাগর সঙ্গীত", "মালঞ্চ", "মালা" "অন্তর্যামী" প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা-সুধা দিয়া চিত্তরঞ্জন বঙ্গবাণীর এই যে রাতুল চরণে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন, তাহার মূলেও আমরা পিতামহ কাশীশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাই। কাশীশ্বর কেবল যে দাতা ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে কেবল পরের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিতেন তাহা নহে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে পরদুঃখ কাতরতার সে বেদনা তিনি বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অনুভব করিতেন, তাহাকে চিত্রময় করিয়া তুলিবার তাঁহার শক্তি ছিল—তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত "নারায়ণ সেবা" ও "হরিরলুটের পাঁচালী"তে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কীট, সেলি, বাইরণ প্রভৃতি প্রতীচির কবিগণের সহজজাত অবৈধ প্রেমের ঝঙ্কার ছিল না সত্য, কিংবা নবীন কবিদের বর্ণিত উদ্ভিন্নযৌবনা নায়িকার অপূর্ব্ব বিরহ উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত সঙ্গীত ধারাও ছিল না সত্য; কিন্তু সে সঙ্গীত ছিল খাঁটি বাঙ্গালা-মায়েব প্রাণের সঙ্গীত—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর ন্যায় অতি মধুর—অতি মিষ্ট। চিত্তরঞ্জন পিতামহ হইতে এই কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কবি যিনি তিনি প্রকৃতিদেবীর মানস-পুত্র। কবিকে তাঁহার কাব্য ও কবিতার ভিতর দিয়াই সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়। কাশীশ্বর যে অতি ভগবদ্বিশ্বাসী, দয়া ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন

তাহা তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা পাঠে জানা যায়। আবার তাঁহারই কবিত্বশক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে চিত্তরঞ্জনের ভিতরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। বস্তুতঃ সাগর সঙ্গীতের কবি চিত্তরঞ্জনের কবিত্বের উৎস তাঁহার পিতামহ কাশীশ্বর। চিত্তরঞ্জনের কবিত্বের পরিচয় আমরা পরে দিব, তাহা পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন চিত্তরঞ্জন ভগবদ্ভক্তিতে কতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি কোট প্যাণ্ট্‌লান পরিয়া বারিষ্টারী করিতেন, সেই সময়েও কবি চিত্তরঞ্জনের অন্তরের অন্তঃস্তল দিয়া ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভক্তির ত্রিধারা ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইত।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ও গোঁড়া ব্রাহ্ম হইলেও পরিণত বয়সে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে বৈষ্ণব কবিতায় এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—বৈষ্ণবের মত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" হইয়াছিলেন তাহার মূল কারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব করার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, অত্যাচার, অযথা নীতিপরায়ণতা, শুষ্ক একঘেয়ে উপাসনা, দরিদ্রের প্রতি নির্ম্মম উপেক্ষা এবং সর্ব্বোপরি চিত্তরঞ্জনের বিবাহের সময় গোঁড়ামীর জন্য কোনও আচার্য্য সহজে না পাওয়ায় সর্ব্বশেষে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৌরহিত্য করায় ব্রাহ্মসমাজে ভীষণভাবে নির্য্যাতিত ও নিন্দিত হওয়ায় তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন তেমনি কবি ছিলেন; তাঁহার রচিত "নারায়ণ সেবা" ও "হরির লুটের পাঁচালী" আজিও ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার ঘরে ঘরে কাশীশ্বর রচিত "নারায়ণ সেবা" ও "হরিনামের পাঁচালী" অত্যন্ত সমাদরের সহিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জন গোঁড়া ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে লালিত পালিত হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে তিনি বহুভক্ত ব্রাহ্মের ন্যায় মনে ও বাক্যে অতি মধুর ভাবাপন্ন ছিলেন। বংশের ধারা কেমন করিয়া পুত্র পৌত্রাদিতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়—চিত্তরঞ্জন তাহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন!

পিতৃপরিচয়

কাশীশ্বরের তৃতীয় পুত্র ভুবনমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন কালের একজন গণ্যমান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণি ছিলেন। যে যুগ-সন্ধিক্ষণে কেশবচন্দ্র সেনের জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেশাচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জলদ গম্ভীর নাদে ভারতের গগন পবন মুখরিত করিতেছিল, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভুবনমোহন হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজোচিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উন্নতিশীল শিক্ষা ও সভ্যতা তাঁহার জীবনকে এবং তাঁহার পরিবারকে উজ্জ্বল ও আদর্শ স্থানীয় করিয়াছিল। তিনি যে গতানুগতিকের অনুসরণ করিয়া হিন্দুর চিরাচরিত পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুব মূল উপনিষদ ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি ইহা সত্য বলিয়া প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভগবানকে যে ভাবেই আরাধনা করা যায় তিনি তাহাতেই প্রীত হন; গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ আমাকে যে যে ভাবেই ভজনা করুক না কেন, সে আমাকে সেই ভাবে প্রাপ্ত হয়। একথা যদি মানিতে হয়, তবে বলিতে হইবে ভুবনমোহন

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের বিবেকের নিকট অপরাধ করেন নাই। বরং তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি যে তাহা অকপটে অবলম্বন করিয়া উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রশংসাই করিতে হয়।

চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বরের তিন পুত্র—দুর্গামোহন, কালীমোহন ও ভুবনমোহন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র—পরলোকগত সত্যরঞ্জন, রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জন এবং ভারতের এড্‌ভোকেট জেনারেল ৺ সতীশরঞ্জন। ভুবনমোহনের তিন পুত্র—চিত্তরঞ্জন,প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। অপুত্রক কালীমোহন বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গামোহন, ভুবনমোহন ও কালীমোহন তিন ভ্রাতাই ব্যবহারাজীব ছিলেন। ভুবনমোহন এটর্ণী এবং দুর্গামোহন ও কালীমোহন উকীল ছিলেন। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই যৌবনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কালীমোহন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার পরিবার অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় দেশবাসীর নিকট পরিচিত নহেন। রসা রোডের যে বৃহৎ প্রাসাদ চিত্তরঞ্জন সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তাহাই কালীমোহনের আবাস ছিল। এই বংশের সকলেই কৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দুর্গামোহন এবং ভুবনমোহন ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং তদানীন্তন সর্ব্বপ্রকার উন্নতিশীল ও জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন নির্ভীক ও তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার সৎমা বালবিধবা ছিলেন, তিনি উদ্‌যোগী হইয়া ও অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তখনকার দিনে সমাজে যে

ভীষণ আন্দোলন হইয়াছিল তাহার বিষয় উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র। তিনি হাইকোর্টে এটর্ণীগিরি করিতেন, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রের সম্পাদকতা করিতেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ওপিনিয়ন পত্রে তিনি সরকারী কার্য্যের—বিশেষতঃ হাইকোর্টের মামলা মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়া বিচারকের কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি থাকিলে তাহার সমালোচনা করিতেন। সে সমালোচনা যেমন তীব্র, তেমনি নির্ভীক। একবার হাইকোর্টের একজন বিচারপতির রায়ের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া ভুবনমোহন পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিচারপতির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ভুবনমোহন সেসন জজ কর্ত্তৃক একজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর পক্ষ হইতে আপীলের দরখাস্ত লইয়া সেই বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হন। বিচারপতি ভুবনমোহনের সেই তীব্র সমালোচনা বিস্মৃত হন নাই, তিনি ভুবনমোহনের কথায় বিশেষ কোন প্রকার মনোযোগ প্রদান করিলেন না। ইহাতে দুঃখিত হইয়া ভুবনমোহন বিচারপতিকে বলিলেন, "আপনি আমার উপর কুপিত থাকিতে পারেন, কিন্তু হাইকোর্টের ধর্ম্মাধিকরণের আসনে বসিয়া কখনও এই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায়-বিচার প্রার্থনার দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।" বিচারপতি ভুবনমোহনের এতাদৃশ তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদীতা ও নির্ভীকতা দর্শনে প্রীত হইলেন এবং সেই আপীল গ্রহণ করতঃ নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার করিয়া আসামীকে মুক্তিদান করিলেন।

ভুবনমোহন এদিকে যেমন "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নে" দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভাব-অভিযোগের কাহিনী নির্ভীকভাবে লিখিতেন,

তেমনি তিনি দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী, প্রতিবেশীদিগকে লালন পালনও করিতেন। ভুবনমোহনের প্রাণের অন্তঃস্থল দিয়া ফল্গুপ্রবাহে দেশাত্মবোধ প্রবাহিত হইত। চিত্তরঞ্জন পরবর্ত্তী জীবনে বিরাট ত্যাগের যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যে তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরোক্ষ প্রভাব সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বাল্য-জীবন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃ পিতামহের জন্মভূমি বিক্রমপুর জেলায় হইলেও চিত্তরঞ্জন কিন্তু ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক তারিখে কলিকাতায় পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থ ভুবনমোহনের আবাসবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পরে ভুবনমোহন ভবানীপুরে উঠিয়া যান। ভবানীপুরে তখন "লণ্ডন মিশনারী স্কুল" নামে একটি স্কুল ছিল, এই স্কুলটী সাধারণতঃ দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন বালকদিগের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন বড়লোকের ছেলে, সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও এই স্কুলেই ভর্ত্তি হয়েন। চিত্তরঞ্জনের নিজ স্বভাবগুণে ও মেলামেশার অদ্বিতীয় ক্ষমতাবলে সকল ছাত্রই মুগ্ধ ও প্রীত হয়। চিত্তরঞ্জন যখন এই স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন তখন হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুমিষ্ট কবিতা বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতেন ও

সমপাঠিদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সে সময়কার হেমচন্দ্র, মাইকেল, রঙ্গলাল প্রভৃতির কবিতাও তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। চিত্তরঞ্জন এই স্কুল হইতেই নূতন নিয়মানুসারে ১৮৮৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া চিত্তরঞ্জন ১৮৮৭ সালে এফ্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ সালে কোন কারণে বি-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯০ সালে বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সেই বৎসরেই সিভিল সার্ব্বিস দিতে বিলাত যাত্রা করেন। তিনি যখন লণ্ডন-মিশনারী স্কুলের ছাত্র তখনই ক্লাসের সহাধ্যায়ীদিগকে লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, কখন কখন বা সহাধ্যায়ীদের সমক্ষে ভারতের প্রাচীন গৌরব-গাঁথা কীর্ত্তন করিতেন। সেই উদ্ভিন্ন যৌবন তরুণের মুখে তখন দেশাত্মবোধের যে প্রদীপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিত তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ-দর্শিগণ বুঝিতে পারিতেন যে, ভবিষ্যতে এই যুবক দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। চিত্তরঞ্জন সেই বয়সেই অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সহাধ্যায়িগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। ইংরাজীতে একটি কথা আছে "Child is the father of man" অর্থাৎ শিশুর আকার প্রকার ব্যবহার দেখিলেই ভবিষ্যতে সে কি হইবে না হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। চিত্তরঞ্জনও যে ভবিষ্যতে একজন বড় বাগ্মী হইবেন এবং দলগঠনে তিনি যে অমিত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহার বাল্যকালেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি সেই পঠদ্দশাতেই সহাধ্যায়িগণের নেতৃত্বপদ

অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের এড্‌ভোকেট জেনারেল চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা মিঃ এস্, আর, দাশ লিখিয়াছেন যে, "চিত্তরঞ্জন যখন লণ্ডন মিশনারী স্কুলের ছাত্র তখন বাড়ীর ছেলেদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেন। উষা-সমাগমে প্রাচী ললাটে উদীয়মান অরুণের অস্পষ্ট রক্তিমাভা যেমন মধ্যাহ্নের জ্যোতিষ্মান্ ভাস্করের প্রচণ্ড কিরণের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করে, তদ্রূপ বালক চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতা এবং সংগঠন শক্তি ভবিষ্যতে ভারতের একচ্ছত্র অবিসংবাদী নেতৃত্বের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিল!"

ইংলণ্ড-যাত্রা

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে বি-এ পাশ করিবার পর ১৮৯০ সালে চিত্তরঞ্জনের পিতা তাঁহাকে সিভিল সার্ব্বিস পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। সে সময়ে বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে সিভিলিয়ান হওয়ার চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কিছুই ছিল না। পুত্রকে সিভিল সার্ভিস পাশ করাইতে পারিলে পিতা মনে করিতেন তাঁহার পুত্রের জীবন ধন্য হইল—পুত্র "মানুষ" হইল—পিতৃকর্ত্তব্যের মহান্ দায়িত্ব হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিলেন। ভুবনমোহনও এইরূপ একটা আশা লইয়া পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। যেদিন বন্ধু-বান্ধব

সহাধ্যায়িগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সুনীল ফেনিল সমুদ্রগর্ভে বিরাটাকায় অর্ণবপোতে চিত্তরঞ্জন জননী জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেদিন কে জানিত যে এই চিত্তরঞ্জনই স্বাধীন দেশের মুক্ত বায়ুতে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আসিয়া দেশের মুক্তির জন্য যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিবেন? তখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনেরা পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে কোন জেলাবিশেষের শাসনকর্ত্তার আসন গ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত প্রতাপে দেশ শাসন করিয়া "দাশ" বংশের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

মিঃ হেন্‌রী কটন বলিয়াছিলেন—One Indian Civilian means an Indian lost to the country." সত্যই যে ভারত সন্তান সিভিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেখা গিয়াছে তিনিই আমলাতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকরূপে আপন কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি কত ভারতীয় সিভিলিয়ানের মনীষা ও প্রতিভা সিভিলিয়ানীর নাগপাশে আবদ্ধ না হইলে দেশ যে ইহাদের নিকট আরও অধিক কিছুর আশা করিতে পারিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিত্তরঞ্জনও সিভিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলে দেশবাসী আজ তাঁহার এরূপ জলন্ত ত্যাগ, বৈরাগ্য ও স্বদেশ সেবার উদার বাণী হইতে বঞ্চিত হইত। তাই বোধ হয় সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও দেশবাসীর অদৃষ্টের এক প্রচ্ছন্ন সুপ্রসন্নতার জন্য চিত্তরঞ্জনকে শিক্ষা-নবিশী করিতে দেওয়া হয় নাই। কেন দেওয়া হয় নাই কারণ—

পার্লামেন্টের তদানীন্তন সদস্য, মিঃ জন ম্যাকনীল (Mr. John Maclean) একটী সভায় ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গোলামের জাতি বলিয়া অবমাননাজনক অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সভায় চিত্তরঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি এরূপ দোষারোপে তাঁহার সুপ্ত আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, সত্যই কি—যে ভারত জগতের সভ্যতার আদি গুরু—যে ভারতের কাছে ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি, ফলিত জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি সমস্ত জগদ্বাসী শিখিয়াছে—যে ভারতবাসী সত্য এবং সরলতার অবতার, সেই ভারতবর্ষ আজ পাশ্চাত্য নিন্দুকের নিন্দার বস্তু! চিত্তরঞ্জন ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে তখন ভারতের প্রাচীন গৌরব-গরিমা একবার স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিলেন—সেই দিনের কথা—যেদিন ভারতের বণিক উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল জলনিধি অতিক্রম করিয়া মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবেস প্রভৃতি দ্বীপে ব্যবসা করিতেন! স্মরণ করিলেন সেই দিনের কথা—যেদিন ভারতের বিজয় সিংহ মুষ্টিমেয় অনুচর সঙ্গে লইয়া সুদূর সিংহল-বিজয় করিয়াছিলেন। মনে করিলেন সেইদিনের কথা—যেদিন পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী আসিয়া নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। চিত্তরঞ্জন যতই প্রাচীন ভারতের গৌরব-গরিমা স্মরণ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ললাটদেশ ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল—দেশাত্মবোধের শ্লাঘায় তাঁহার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ইংলণ্ডে যত ভারতীয়

ছাত্র ছিল তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান করিলেন। সেই সভায় চিত্তরঞ্জন জ্বালাময়ী ভাষায় মিঃ ম্যাকনীলের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভারতবর্ষ যদিও ভাগ্যদোষে আজ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহা হইলেও ভারতের আদর্শ জগতের অনুকরণীয়—ভারতবর্ষ জগতের আধ্যাত্মিক জীবনের গোমুখী—ভারত-বাসী প্রতীচ্য জাতিব ন্যায় ইহকাল সর্ব্বস্ব ভোগ-বিলাসেব বেদীতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করে নাই। চিত্তবঞ্জনের সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য মিঃ ম্যাক্‌লীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন; অবশেষে অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, মিঃ ম্যাক্‌লীন ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন এবং অচিরাৎ তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল।

এই ঘটনায় চিত্তয়ঞ্জনের নাম ইংলণ্ডের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, পার্লামেণ্টের সদস্য এবং এমন কি মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন চিত্তরঞ্জনকে ভারতীয় অবস্থা বিবৃত করিবার জন্য একটি সভায় আহ্বান করিলেন। চিত্তরঞ্জন স্বভাবসুলভ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ভারতের দুরবস্থার কথা একে একে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে বৈদেশিক বণিকের প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্পবাণিজ্য লোপ পাইয়াছে, কি প্রকারে সরকারী চাকুরীতে ভারত গবর্ণমেণ্ট অধিক সংখ্যক শ্বেতাঙ্গের নিয়োগ করিয়া ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিতেছেন, কি প্রকারে ভারতবাসীর খাদ্য শস্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া লইয়া যাইবার ফলে ভারতবাসী দিন দিন অন্নাভাবে মাবা যাইতেছে, রেলপথাদি বিস্তৃত হওয়ায় জল নিকাশের অভাব হেতু কি ভাবে বঙ্গবাসী

ম্যালেরিয়ার হস্তে প্রত্যহ পতিত হইতেছে, ভারতের রাজস্ব বহু অংশে বিলাতে চলিয়া যায় এবং শতকরা ৬৫ ভাগ সৈনিকবিভাগে ব্যয়িত হয়। দেশবন্ধু সেই সভায় একে একে তাহা বিবৃত করেন। একে তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষা, তদুপরি তাঁহার প্রত্যেক কথা স্বদেশপ্রেমের পূত অমিয়ধারায় অভিসিঞ্চিত, সেই বক্তৃতার ঝঙ্কারে উপস্থিত সমস্ত শ্বেতাঙ্গ বুঝিলেন এই উদীয়মান বক্তা নিতান্ত কাপুরুষ নহেন; পরন্তু জ্বলন্ত অগ্নিস্ফূলিঙ্গ এ যুবকের প্রাণে প্রচ্ছন্নভাবে দেশাত্মবোধের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত। এ যুবক সিভিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে কখনও আমলাতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদনীতির সমর্থন করিবে না। শুনা যায়, দাশ মহাশয় সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও শুধু এই বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে শিক্ষানবীশ পদে নিযুক্ত না করিয়া তাঁহার নিম্নোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়।

চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দেশের পক্ষে তাহা পরম সৌভাগ্যের নিদর্শনই বলিতে হইবে। তখন তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য সংকল্প করিলেন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের বয়স মাত্র একবিংশতি বর্ষ।

ইহার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন মহামতি দাদাভাই নৌরজীর পার্লামেণ্টে সদস্য পদে নির্ব্বাচনের জন্য তুমুল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবাসী বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় প্রবেশ করিলে ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ইংলণ্ডবাসীর কর্ণগোচর করিতে পারিবেন, তাহাতে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের কথঞ্চিৎ প্রশমন হইলেও হইতে পারে, শুধু এই সাধু ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চিত্তরঞ্জন অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা দ্বারা দাদা

ভাইয়ের নির্ব্বাচনের অনুকূলে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইংলণ্ডবাসী একজন বাঙ্গালী যুবকের এতাদৃশ নির্ভীকতা, ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতার এইরূপ অগাধ অধিকার দর্শনে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। একথা বলা বোধহয় নিতান্ত অন্যায় হইবে না যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অক্লান্ত চেষ্টা ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার ফলে সেণ্ট্রাল ফিন্‌স্‌বারি কেন্দ্র হইতে মহামতি দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী এই সম্মানার্হ পদের অধিকারী হন নাই।

চিত্তরঞ্জন যে সময়ে সিভিল সার্ভিস পড়িতে যান, সে সময়ে তাঁহার পিতা ভুবনমোহনের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। অভিমন্যু যেমন সপ্তরথী কর্ত্তৃক চারিদিক হইতে পরিবৃত হইয়াছিলেন ভুবনমোহনও তেমনি চারিদিক হইতে উত্তমর্ণগণের ঘন ঘন তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঋণ করিয়া চিত্তরঞ্জনকে সিভিল সার্ভিস পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। বড় আশা ছিল, পুত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া তাঁহাকে ঋণরূপ রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল। হঠাৎ একটা বজ্রাঘাতে তাঁহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, চিত্তরঞ্জন—ভুবনমোহনের বড় সাধের চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পুত্রের এই অকৃতকার্য্যতার সংবাদ দারুণ শক্তিশেলেরই ন্যায় বৃদ্ধের বক্ষে বিদ্ধ হইল।

কিন্তু একের পক্ষে যাহা নিরানন্দের কারণ, অপরের নিকট তাহাই

আবার আনন্দের আধার। পেচকের নিকট দিবসের আলোক অপ্রীতি-কর হইলেও লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট তাহা বড়ই প্রীতিদায়ক। আকাশে নিবিড় জলদজাল গৃহহীনের পক্ষে নিরানন্দের কারণ হইলেও শিখীর কাছে কিন্তু তাহা বড়ই প্রীতিকর। সে মেঘ দেখিলেই পেখম মেলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। বহু অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিসে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া পিতা ভুবনমোহনের মুখখানি নিরাশার গভীর বেদনায় সমাচ্ছন্ন হইলেও, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী কিন্তু অলক্ষিতে আনন্দের হাসি হাসিয়াছিলেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন সসম্মানে ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং ১৮৯৩ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বিলাত গিয়াছিলেন; অনেকে বিলাত হইতে পুরাদস্তুর সাহেব সাজিয়া দেশে ফিরিতেন। কেহ কেহ এদেশে ফিরিয়া তিন বৎসর বিলাতবাস হেতু দেশের আমগাছ গাবগাছ প্রভৃতি চিনিতে পারিতেন না। অনেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে বিলাত গিয়া "বোনার্জ্জী" হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। কুঠীতে ইঁহাদের ভোস সাহেব, মিটার সাহেব, ডাট সাহেব প্রভৃতি সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, অথচ চেহারায় ইঁহারা কিন্তু ঠিক সাঁওতালীদেরই মত, ফাঁকতাল্লায় ইঁহারা স্বদেশ সেবক সাজিয়া নিজেদের উপার্জ্জনের পথ মুক্ত করিয়া লয়েন। ইঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া ধুতি চাদর পরিধান করা, বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা, ফরাসের উপর বসিয়া মজলিসী আলাপ করা তখনকার বিলাত ফেরতাদের

পক্ষে মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। তিনি বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিয়াই বাঙ্গালীর কায়দায় বন্ধু-বান্ধবগণকে নমস্কার করিলেন; বাড়ীতে আসিয়া বাঙ্গালীভাবেই সকলকে অভিনন্দন করিলেন, তাঁহার হাব-ভাব, আচরণে সাহেবিয়ানার একটু আভাসও কেহ দেখিতে পাইল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার "মিঃ সি, আর দাশ" বলিয়া সভাসমিতি ও কোর্টে উপস্থিত হইতেন বটে, কিন্তু কখনও সাহেবিয়ানার ব্যর্থ অনুকরণে কোনদিন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দেন নাই। সাহেবিয়ানার প্রতি তাঁহার এইরূপ বীতশ্রদ্ধা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিতেন যে "বাঙ্গাল বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'লে কি হয়, বিক্রমপুরের চালচলন কি সহজে ছাড়তে পারে?" চিত্তরঞ্জন এই উপহাসবাণী শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেন, কি দুর্দ্দৈব! বাঙ্গালীর ছেলে, হ্যাট্ কোট না পরিয়া কাপড় পরিলেই তাহার জাতি যায়! এইরূপ অধঃপতন না হইলে কি এই হতভাগ্য জাতি মরে?

ব্যারিষ্টারী করিবার খাতিরে চিত্তরঞ্জন সাহেবী হ্যাট্ কোট পরিতেন বটে, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়াই বাঙ্গালীর বেশভূষা ধুতি চাদরে সুসজ্জিত হইতেন।

আইন ব্যবসা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। সে সময়ে তাঁহার পিতৃসংসারে টাকা-পয়সার বড়ই অস্বচ্ছলতা। তিনি যদি সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেন এবং মাসে মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট মোটা বেতন পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃ-সংসারের অনেক অভাব দূর হইত বটে, কিন্তু তাহা হইল না। ব্যারিষ্টারী করিতে গেলে যেরূপ পোষাক, পরিচ্ছদ, সাজ-সরঞ্জাম কিনিতে হয়, যেরূপ গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর দরকার হয় চিত্তরঞ্জনের তাহার কোনই সংস্থান ছিল না। এদিকে পিতা ভুবনমোহন ঋণের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইলেন, চিত্তরঞ্জনও পিতার সঙ্গে সঙ্গে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইলেন। দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে একদিনের জন্যও এ সঙ্কল্প উপস্থিত হইল না যে, তিনি কখনও পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবেন। তিনি মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, যদি ভগবান কখনও দিন দেন, তবে তিনি যে ভাবেই হউক পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিবেন।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের মনে যে কি দুশ্চিন্তা তাহা কল্পনাতীত।

একদিকে সংসারে দারুণ অর্থাভাব—অন্যদিকে হাইকোর্টে প্রবল প্রতিযোগিতা, এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন যে কি মর্ম্মন্তুদ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি যে সময়ে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন, তখন মিঃ এস্, পি, সিংহ (বর্ত্তমানে লর্ড) মিঃ নর্টন প্রভৃতি বড় বড় ব্যারিষ্টার হাইকোর্টে অধিষ্ঠিত। কাজেই এই সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারদের সমক্ষে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া চিত্তরঞ্জনকে বাধ্য হইয়া মফঃস্বলের আদালতে অতি অল্প টাকায় মোকদ্দমা পরিচালনার ভার লইয়া যাইতে হইত। এই সময় চিত্তরঞ্জন কোনও মামলা গ্রহণ করিয়া নোয়াখালি গিয়াছিলেন। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্গিল সে মামলার একজন অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। আইনানুসারে সাক্ষীকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হয় কিন্তু তিনি, বিচারকের পাশে চেয়ারেই উপবেশন করেন। ভদ্রতার খাতিরে চিত্তরঞ্জন তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বিচার আরম্ভ হইলে চিত্তরঞ্জন মিঃ কার্গিলকে জেরাতে অস্থির করিয়া তুলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জেরাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনকে অপমান করিবার জন্য 'বাবু' সম্বোধন করেন। তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া 'বাবু' বলায় চিত্তরঞ্জন সে অপমান হজম না করিয়া গম্ভীরস্বরে কার্গিলকে কাঠগড়া দেখাইয়া সেখানে দাঁড় করাইয়া দেন। এমনই চিত্তরঞ্জন সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। কয়জন নবীন ব্যারিষ্টার এমনই সাহস দেখাইতে পারেন? এই ঘটনার পরই তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে একেবারে সমাহিত হন। কি প্রকারে আইনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবে পরিণত হইতে

পারেন; প্রতিনিয়ত কেবল সেইজন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিরই আইনগ্রন্থ তন্ময়চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। দিন নাই, রাত নাই, চিত্তরঞ্জন কেবল আইন অধ্যয়ন করিতেছেন! এই ভাবে অধ্যয়ন করিতে করিতে ব্যবহার শাস্ত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবে পরিণত করিয়াছিল।

বিবাহ

১৮৯৮ সালে বাসন্তী দেবীর সহিত পবিত্র ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে ৩ আইনে রেজেষ্ট্রী করিয়া চিত্তরঞ্জনের শুভ বিবাহ হয়। বাসন্তী দেবী বিজনী ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ৺বরদাপ্রসাদ হালদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের ভগিনী। বংশমর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় হালদার বংশ অতি বনিয়াদী বংশ। এই হালদার বংশের আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা বাসন্তী দেবীর সহিত স্যার এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিবার জন্য ৺বরদাবাবু তাঁহাকে সিভিল সার্ব্বিশ পাশ করিতে বিলাত প্রেরণ করেন ও সমস্ত খরচ বহন করেন। তত্রাচ এ বিবাহ হয় নাই। তখন এলিবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার কে, জি, গুপ্তের কন্যাকে

বিবাহ করেন আর বাসন্তী দেবীর সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বিবাহ হয়।

বাসন্তীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মাধুরী দেবীর সহিত জগৎচন্দ্র দাসের পুত্র ব্যারিষ্টার চারুচন্দ্র দাসের বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

বাসন্তী দেবী যে পতিভক্তি, সরলতা, অমায়িকতা, স্বজন বাৎসল্য প্রভৃতি নানাগুণে পিতৃপিতামহের বংশের অনুরূপ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? চিত্তরঞ্জন যোগ্য সহধর্ম্মিণী পাইয়াছিলেন বলিয়া জীবন-সংগ্রামে এতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। মানুষ অনেক সময় নিজের মনোমত যোগ্য সহধর্ম্মিণী পায় না বলিয়া জীবন-সংগ্রামে একাকী প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দেশের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া হয়ত খদ্দরে বিভূষিত হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করিলে দেখিবে বিলাসিনী স্ত্রী ম্যাঞ্চেষ্টারী মিহি সুতার বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বদেশী বস্ত্রোন্নতির মুখে কুঠারাঘাত করিতেছেন। যে ব্যক্তি হয়ত শিক্ষকতার পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দারিদ্র্য-দুঃখকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মাথায় বরণ করিয়া লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যায়, তাহার স্ত্রী হয়ত দেশের কথা ভ্রমেও একবার চিন্তা করেন না। বাঙ্গালী জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ এই যে, এ জাতির অন্তঃপুরচারিণীরা অশিক্ষিতা ও বহির্জগতের জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বলিয়া ইহারা বাহিরে কোন সৎকর্ম্ম করিলে ভিতরে সেজন্য কোন পুরুষকে কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান করেন না। এই কারণে অনেক বাঙ্গালী যুবককে

দেখা যায় অবিবাহিত জীবনে তাহারা পরার্থে অনেক কাজ করিলেও, বিবাহিত জীবনে তাঁহারা এরূপ ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়েন যে,—দেশের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে গোয়েন্দাগিরি পর্য্যন্ত করিতে দেখা গিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন যদি বাসন্তী দেবীর ন্যায় পতিপরায়ণা, সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার জীবনের স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইত তাহা কে বলিতে পারে? চিত্তরঞ্জন যেদিন হইতে ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া খদ্দরে ভূষিত হইয়া দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, বাসন্তী দেবীও সেইদিন সমস্ত প্রকারের বিলাস সম্ভার পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, অত্যুগ্র সাধনা, বাসন্তী দেবীর উপর সর্ব্বাগ্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই পরবর্ত্তীকালে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় বাসন্তী দেবীও ননদ ঊর্ম্মিলাদেবী প্রভৃতির সহিত খদ্দর প্রচারের জন্য পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। হৃদয়ে অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম না থাকিলে কেহ কি এরূপভাবে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া কারাগারকে তুচ্ছ করিতে পারেন? বাসন্তী দেবীর সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন—"চিত্তরঞ্জনকে আমি বাল্যকাল হইতেই জানি। তোমার শ্বশুর পরিবারের সহিত তখনকার দিনে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। সামান্য কোন মেয়েলি ক্রিয়া কর্ম্মতেও দাশ মহিলাগণ আমাদের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিত হইতেন। তোমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী এরূপ সময়ে প্রায়ই দুই একটি ছোটছেলে মেয়ে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সে আজ বহুদিনের কথা, চিত্তরঞ্জনের বয়স বোধ হয় তখন ছয় সাতের

অধিক নহে। মাতার সহিত ছেলে যখন মেয়ে মজলিসে আসিয়া দাঁড়াইত, চেহারা ও নামে তাহার পূর্ণ মিল দেখিতে পাইতাম। চোখ দুটি ছিল তার বুদ্ধি সমুজ্জল এবং মুখখানি ছিল বেশ একটু ভাব-গম্ভীর। বাল-মুখে বাল-সুলভ সেই গাম্ভীর্য্যটুকু আমার বড়ই মিষ্ট লাগিত। তাহার দিকে চাহিতে নয়ন মন যেন তাহাতে বাঁধা পড়িয়া যাইত। একদিন এই বালকের এই চিত্তরঞ্জন রূপ মুগ্ধ নয়নে দেখিতে দেখিতে তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এই ছেলেটী দেখছি বড় হ'য়ে নিশ্চয়ই একজন বড়লোক হ'বে।" সেদিন হাসিতে হাসিতে যে কথা বলিয়াছিলাম, ভবিষ্যদ্বাণীর মতই পরে বর্ণে বর্ণে তাহা সফল হইয়াছে। বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি অনন্য'সাধন করিয়াছেন। এখন তিনি মহারথী। মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে পরাক্রান্ত শত্রু দুর্গ-শিখরে স্বরাজ পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তাঁহার অসীম সাহস, নির্ভীক প্রতাপে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হায়! তাঁহার মত যুদ্ধজয়ী বীর আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বরাজ-রাজ্য আজ ঘোর বিপত্তি সঙ্কুল। তাঁহার মত মহা-প্রতাপে—কে আর ইহাকে রক্ষা করিবে?

বাসন্তি! তাঁহার বিয়োগে তুমি ত আজ একা পতিহীনা হও নাই, দেশের লক্ষ লক্ষ—কোটী কোটী লোক প্রভুহীন—নেতাহীন—সহায় বন্ধুহীন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; কিন্তু এ রোদন কি শুধুই স্বার্থহানি-জনিত দুঃখাবেগ মাত্র? না—না, তাহা নয়। সমগ্র দেশের শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ শোকাঞ্জলি বর্ষিত হইতেছে। এই মাহাত্ম্যময় কৃতজ্ঞতা তর্পণে

মৃত্যুর মধ্যেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী মূর্ত্তিতে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মৃতিমন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।

বাসন্তি, তুমি সৌভাগ্যবতী রমণী! তাঁহার সহধর্ম্মিনী হইয়া তুমি যে আদর্শ শিক্ষাদীক্ষারূপ মহৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ, কোন রাজরাণীর ভাগ্যেও সেরূপ ঐশ্বর্য্য ঘটে না। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী আজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তোমার মহাক্ষতি অপেক্ষাও সেই দিকই তুমি বড় করিয়া দেখিতেছ এবং তাহার সহিত একযোগে তুমি দেশ সেবাতে যেরূপ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলে, অতঃপর তাঁহার অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যসাধন অভিপ্রায়ে সেইরূপই একান্ত উদ্যমে দেশহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহাতে আমার মনে সন্দেহ মাত্র নাই।”

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন নামতঃ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইলেও পুলিশ কোর্ট, জেলা কোর্ট এবং মফঃস্বলের আদালতে ব্যারিষ্টারী করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তারপর এক ভাগ্যচক্রের অদৃশ্য আবর্ত্তনে চিত্তরঞ্জনের সৌভাগ্যের অর্গল উন্মুক্ত হইল।

সে ১৯০৫ সালের কথা। ভারতের রাজপ্রতিনিধির আসনে তখন

বড়লাট ৺লর্ড কার্জ্জন সমাসীন। রাজনীতিক দিক হইতে তিনি বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিবেন। বড়লাটের ইচ্ছা, কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কর্ত্তা যদি তাঁহার অভিমত সমর্থন না করেন, এই আশঙ্কায় স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার নামক অন্য প্রদেশীয় সিভিলিয়ানকে আনিয়া তিনি বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইল। ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্টের রাজধানী স্থাপিত হইল। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। ভারত সভার সভাপতিরূপে ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যার) লর্ড কার্জ্জনের এই স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করিয়া ইংলণ্ডে তদানীন্তন ভারত সচিব ৺লর্ড মর্লির নিকট তার করিলেন, কিন্তু লর্ড মর্লি বলিলেন—Bengal partition is a settled fact. অর্থাৎ বঙ্গ বিভাগ একটি নির্দ্ধারিত ব্যাপার, ইহার আর কোন অদল বদল হইতে পারে না। কলিকাতার টাউনহলে মহারাজ স্যার ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ঘোষণা করেন, "যেহেতু লর্ড কার্জ্জন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গ বিভাগ করিলেন সেই হেতু বাঙ্গালী মাত্রেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি (Passive resistance) অবলম্বন করিবেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিবেন না, বিদেশী দ্রব্য পুরীষ ও নিষ্ঠীবনের ন্যায় ঘৃণার সামগ্রী বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিলে ম্যাঞ্চেষ্টার, ল্যাঙ্কেসায়ারের

বণিককুল ভারতে তাহাদের মালের কাটতি না হওয়ায় অন্নাভাবে বাধ্য হইয়া মন্ত্রিসভাকে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রত্যাহার করিতে পীড়াপীড়ি করিবে—বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতীকার হইবে।"

দেশবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ৺সুরেন্দ্রনাথের এই যুক্তিতর্ক গ্রহণ করিল। বহুদিন ধরিয়া আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতায় সকলেরই প্রাণে একটু অধিকার লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল, সুরেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণকুমারের বজ্র নির্ঘোষ হুঙ্কারে সুপ্ত বাঙ্গালী তাই বহুদিনের তন্দ্রালস ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে নিদ্রোত্থিত বাঙ্গালীর ছেলেরা একতানে সমস্বরে গান করিতে লাগিল :—

"আমরা মিলেছি আজ
মায়ের ডাকে।
ঘরের ছেলে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।"

বঙ্গ জননীর অঙ্গচ্ছেদের এই নিদারুণ ব্যথা সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত হইল। বাঙ্গালীর অপমানের তীব্র যন্ত্রণা মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। মহারাষ্ট্র-কেশরী লালা লাজপত রায়, যুক্তপ্রদেশের অধিনায়ক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মনীষি গোখেল, ওয়াচা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক নেতাগণ বাঙ্গালীর এই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ফলে সমগ্র ভারতময় এক তুমুল জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বাঙ্গালায় বঙ্গলক্ষ্মী মিল, বোম্বাইয়ে বোম্বাই মিল, আমেদাবাদে আমেদাবাদ মিল প্রতিষ্ঠিত হইল। চারিদিকে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের এক তুমুল সাড়া পড়িয়া

গেল। বাঙ্গালায় ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺মতিলাল ঘোষ, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৺অশ্বিকাচরণ মজুমদার ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, কলিকাতার মেয়র ব্রাহ্ম জে, এম, সেনগুপ্তের পিতা ৺যাত্রামোহন সেন, ৺বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সমগ্র বঙ্গে জাতীয়তার একটা প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ছেলেরা সব দলে দলে গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে পড়িব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সেই সব ছাত্রদিগকে জাতীয়-ভাবে অর্থ-করী স্বাধীন জীবিকাপ্রদ শিক্ষা দিবার জন্য দেশনেতৃবৃন্দ একটি জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। ময়মনসিংহের মহারাজা ৺সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, আর এক লক্ষ টাকা দান করিলেন—রাজা সুবোধ মল্লিক। ইঁহাদের অর্থ লইয়া ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইল। ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যার ৺আশুতোষ চৌধুরী সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহক হইলেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু যোগ্য অধ্যক্ষ কোথায়? কে এমন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ আছেন যিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এই বিরাট কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন? চারিদিকে

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, হঠাৎ একদিন শুভ প্রভাতে সংবাদ আসিল বরোদা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের (Principal) পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তখন অরবিন্দ কে তাহা অনুসন্ধানের জন্য দেশবাসী প্রবৃত্ত হইল। প্রকাশ পাইল, অরবিন্দ খুলনার সিভিল সার্জ্জন ব্রাহ্ম ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের মধ্যম পুত্র। অরবিন্দ ইংলণ্ডে শিশুকাল হইতে লালিত পালিত ও শিক্ষিত—তিনি সিভিল সার্ভিসে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ধারে ধারে ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে অনেক বৃটিশ বিদ্বেষী কথা লেখায় তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করা হয় নাই। অরবিন্দ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বহু ভাষাবিৎ, সুপণ্ডিত, তিনি মাত্র ৭৫৲ টাকায় ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপালি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বরোদায় তিনি প্রায় ১৫ শত টাকা পাইতেন। বরোদার মহামান্য মহারাজ গাইকোয়াড় তাঁহাকে বিশেষ আদর, যত্ন ও সমাদর করিতেন, এ সব রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া অরবিন্দ মাত্র ৭৫৲ টাকায় কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপালি পদ গ্রহণ করিতে আসিলেন।

বাঙ্গালা দেশ এরূপ ত্যাগের পরিচয় পূর্ব্বে পায় নাই। অরবিন্দের বিরাট ত্যাগ দর্শনে বাঙ্গালী তাহাকে নব জাতীয়তা মন্ত্রের গুরুপদে বরণ করিল। বাঙ্গালাদেশে অরবিন্দের নেতৃত্বে আর একদল শক্তিশালী জাতীয় কর্ম্মীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতায় সেই দল আরও শক্তিশালী হইল। এইরূপে ক'বৎসর কাটিয়া গেল।

আলীপুর বোমার মামলা

এই দলস্থ কেহ কেহ বিধিসঙ্গত আন্দোলনের (Constitutional agitation) পথ পরিত্যাগ করিয়া রুষিয়ার নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় গুপ্ত হত্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা ভারতে বৃটিশ শক্তির উচ্ছেদ সাধনে কৃত সঙ্কল্প হইল। ইহাদের সহিত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু মজঃফরপুরে মিঃ কেনেডি ও তাঁহার নির্দ্দোষ দুইটী দুহিতা মিস কেনেডিদ্বয়কে জজ কিংসফোর্ড ভ্রমে অন্যায়রূপে ৺ক্ষুদিরাম ও ৺প্রফুল্ল চাকী কর্ত্তৃক বোমার দ্বারায় হত্যা করায় এবং বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হওয়ায় ও প্রফুল্ল চাকী ধৃত হওয়া মাত্রই রিভলভরের দ্বাবায় আত্মহত্যা করার সময় মুরারীপুকুর বাগানে যখন পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া বারীন্দ্র ঘোষ, কানাই দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিল, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষও গ্রেপ্তার হইলেন। আর একদলে বিভিন্নস্থানে চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র দত্ত, জাহ্নবীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুধাকৃষ্ণ বাগচি, শক্তিপদ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি ধৃত ও হাজতে নীত হইল, তখন দেশময় একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। পুলিশ মুরারীপুকুর বাগান

খানাতল্লাসী করিয়া অনেক বিস্ফোরক দ্রব্য, ডিনামাইট ও বোমা আবিষ্কার করিল। আলিপুরের সেসন জজ অরবিন্দ ঘোষের সহপাঠী মিঃ বিচ্ ক্রফ্টের এজলাসে এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইতে লাগিল। আসামীদের পক্ষে প্রথমে হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মডারেট ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করা হইল, তিনি কয়েকদিন মোকদ্দমা চালাইবার পর আসামীপক্ষ তাঁহাকে টাকা দিতে না পারায় তিনি মোকদ্দমা পরিচালনের ভার ছাড়িয়া দিলেন। অপরাপর আইন ব্যবসায়ীরা কেহ অর্থ পাইবেন না বলিয়া, কেহ বা সরকারের বিষনজরে পড়িবার ভয়ে সে মামলা গ্রহণ করিলেন না তখন অকুলের কাণ্ডারী বিপদভঞ্জন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন স্বয়ং নারায়ণ উপস্থিত হইয়াছেন। চিত্তরঞ্জন এই কথা স্মরণ করিয়া নাকি পরবর্ত্তীকালে 'নারায়ণ' নামে একখানি মাসিকপত্র বারীন ঘোষ প্রভৃতিকে বিপ্লববাদ হইতে দূরে রাখিয়া তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ আট মাসকাল মামলা চলিল। চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব্ব আইন বিশ্লেষণ শক্তি ও অনন্যসাধারণ যুক্তিতর্কের প্রভাবে দেশপূজ্য শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করিলেন। বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে মুক্তি পাইলেন, দেশময় চিত্তরঞ্জনের প্রশংসার ধ্বনি উত্থিত হইল। তদবধি শ্রেষ্ঠব্যবহারজীব বলিয়া চিত্তরঞ্জন ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে লাগিলেন। আলীপুর বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জনের বিপক্ষে প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন দাঁড়াইয়াছিলেন।

এই মামলা পরিচালনে চিত্তরঞ্জন আসামীপক্ষ হইতে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু অন্য মামলা গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় তাঁহাকে গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিতে এবং ঋণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। সেসন কোর্ট হইতে হাইকোর্টে যখন মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ উড্রফের এজলাসে এই মামলার শুনানী হইতে থাকে, তখন চিত্তরঞ্জন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিতে করিতে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সময় সময় তিনি অশ্রু পর্য্যন্ত সংবরণ করিতে পারেন নাই। যেমন কোর্ট হইতে অরবিন্দকে মুক্ত করিয়া চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন অমনি কোর্টের বাহিরে বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাদিগকে যেভাবে বিপুল সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। ইহা ১৯০৯ সালের কথা।

আলিপুর বোমার মামলায় কৃতীত্ব প্রদর্শনের পর চিত্তরঞ্জনের উপর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন। ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার ভার চিত্তরঞ্জনের উপর অর্পিত হইল, চিত্তরঞ্জন এই মামলাতেও যথেষ্ট আইন জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। অতঃপর নানাদিক হইতে স্বদেশী মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য চিত্তরঞ্জনের আহ্বান আসিতে লাগিল, চিত্তরঞ্জন কখনও বা পারিশ্রমিক লইয়া, কখনও বা বিনা পারিশ্রমিকে, কখনও বা নামমাত্র পারিশ্রমিকে সেই সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আর্থিক ক্ষতি হইলেও চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। অন্যান্য মামলা পরিচালনা করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময় দৈনিক আগত সাধারণ মামলা সকলের আয় ব্যতীত মিউনিসিনি বোর্ডের মামলায় মাসিক ৪৫ হাজার টাকা ও পাটনা ডুমরাওনের মামলায় মাসিক ৫০ হাজার টাকা করিয়া পাইতেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তিনি এ সকল বিরাট আয় সম্পন্ন মামলাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে এই ডুমরাওনের মামলাই ৩ লক্ষ টাকায় বন্দোবস্ত করিয়া স্যার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই মামলার পরিচালনাকালেই তাঁহার পাটনাতেই মৃত্যু হয়।

বাওলা হত্যাকাণ্ড মামলা পরিচালনার জন্য তাঁহাকে ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা আসামী পক্ষ দিতে চাহিয়াছিল তিনি সে মামলা অসহযোগ নীতির জন্য গ্রহণ না করায় কলিকাতার মেয়র ৺ জে, এম, সেনগুপ্ত তাঁহার স্থলে সে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

পিতৃঋণ ও চিত্তরঞ্জন

মোকদ্দমার উপর মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়া চিত্তরঞ্জন প্রভূত ধনের অধিকারী হইলেন। ধনলাভ করিয়াই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল— পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার দিকে। চিত্তরঞ্জন ইচ্ছা করিলে পিতৃঋণ পরিশোধ না করিতেও পারিতেন, কেননা—তিনিও পিতার সহিত

একযোগে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আর সে ঋণ পরিশোধ নাও করিতে পারিতেন তাহাতে উত্তমর্ণ বা আইন কেহই কিছু করিতে পারিত না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রাণ ত আর সেরূপ নয়। টাকা হাতে পাইয়াই তিনি উত্তমর্ণদিগকে একে একে টাকা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি প্রায় ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকার তামাদী ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ কল্পনাতীত সততা দর্শনে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ফ্লেচার পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, "দেউলিয়া হইয়া আবার এরূপ প্রভূত পিতৃঋণ পরিশোধ করে, এরূপ লোক তিনি জীবনে দেখেন নাই!" ইহাই তাঁহার জীবনের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিশেষত্ব।

পারিবারিক জীবন

চিত্তরঞ্জন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলে চিত্তরঞ্জনকেই ভ্রাতা ভগ্নীদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভগ্নীদের বিবাহের ভারও তাঁহার উপরই পড়িয়াছিল। তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয়ে ভগ্নীদিগকে সৎপাত্রে দান করেন। তিনিই অর্থ ব্যয় করিয়া সহোদর দুইটিকে ও তাঁহার ভাগ্নে এবং লেখকের মাসতুত ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত সুধাংশু গুপ্তকে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়

পাশ করিয়া আনেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী একটী পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া অল্প বয়সে বিধবা হন। আর একটি ভগ্নীও রোগে ভুগিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তরঞ্জন যখন ব্যারিষ্টারীতে কেবল প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ কালের করাল আহ্বানে তিনি মরজগত ত্যাগ করেন। চিত্তরঞ্জনের একমাত্র জীবিত সহোদর ব্যারিষ্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এখন পাটনা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন সাধারণতঃ "মিঃ পি. আর, দাশ" নামেই খ্যাত। চিত্তরঞ্জনের সহোদরা অমলা দাশ গুপ্তা অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগিনী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্ব্বে চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী উর্ম্মিলা দেবীর স্বামী অনন্তবাবু অনন্তধামে চলিয়া যান। এই সময় ভগ্নীর বৈধব্য দশা দেখিয়া চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত শোক-বিহ্বল হইয়া পড়েন। বাসন্তী দেবী এই সময় সর্ব্বদা চিত্তরঞ্জনের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতেন। বাসন্তী দেবী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতি আদর্শ মহিলাগণের মূর্ত্ত্য বিগ্রহ। শোকে তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দান করিতেন, কর্ম্মজীবনে স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন, একদিনের জন্যও স্বামীর অভিমতের বিপক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। চিত্তরঞ্জন যখন মাসিক ৪০।৫০ হাজার টাকা উপার্জ্জনের ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবাব্রতের জন্য "সন্ন্যাস" ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সে শুভ সংবাদে সর্ব্বাগ্রে বাসন্তী দেবীই অধিক আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন পারিবারিক জীবনে যেমন স্নেহপরায়ণ পিতা, প্রীতির আধার সহোদর, প্রীতির আধার স্ত্রী পাইয়াছিলেন তেমনি সামাজিক জীবনেও তিনি অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। যখন

ব্যারিষ্টারী করিয়া তিনি মাসিক হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন তখনও সামান্য মজলিসে সাধারণ লোকের সহিত মিলামিশা করিয়া তাহাদের সঙ্গে একত্রে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদক হিসাবে যে কোন নবীন প্রবীণ সাহিত্যিক তাঁহার নিকট যাইতেন, তিনি অতি অমায়িকভাবে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। তিনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যদি তাহা সঞ্চয় করিবার বিন্দুমাত্র অভিলাষ তাঁহার থাকিত তবে তিনি বড় জমিদারী ও বিপুল বিষয় কিনিয়া রাজা রাজড়ার মত সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিতেন। অথবা যদি রাজ সরকারের তোষামোদ করিয়া বড় উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার থাকিত, তবে তিনি "নাইট,", "কে, সি, আই, ই" প্রভৃতি উচ্চ সম্মানজনক উপাধি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন মনে প্রাণে স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। আবাল্য তাঁহার প্রাণ দেশাত্মবোধে অভিভূত ছিল সেজন্য এ সকল আকাঙ্ক্ষা তিনি ঘৃণার সহিত পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন।

বিরাট দান

চিত্তরঞ্জনের শেষ জীবনের অসামান্য ত্যাগের কথা বলিতেছি না, তিনি যখন ব্যারিষ্টার ও ভোগ বিলাসে মগ্ন তখন তিনি কি পরিমাণ গুপ্ত ও প্রকাশ্য দান করিয়াছিলেন তাহার দুই একটি মাত্র উদাহরণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি যে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, সে কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাঁহার যে দান তাহারই সামান্যমাত্র উল্লেখ এস্থলে করিব। দীন, দুঃখী, দরিদ্রের প্রতি সমবেদনার যে ফল্গু-ধারা প্রবাহিত হইত শত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তিনি সেই পরদুঃখ-কাতরতা বিস্মৃত হন নাই। দরিদ্রের ব্যথা দেখিলে চিত্তরঞ্জনের প্রাণ বিগলিত হইত। তাই তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া আতুর অভাবগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে কেহ হাত পাতিয়াছে তাহাকেই আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়াছেন। এমন কি প্রবঞ্চককে প্রবঞ্চক জানিয়াও তিনি তাহাকেও অর্থদানে বঞ্চিত করেন নাই। 'না' শব্দ তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইতে পারিত না, এমনই কমনীয় ও নমনীয় ছিল চিত্তরঞ্জনের চিত্ত!

কলিকাতা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণে চিত্তরঞ্জন অকাতরে অর্থ দান করিয়াছিলেন, বেলগাছিয়ার মেডিক্যাল কলেজও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বহু অর্থ পাইয়া ঋণী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে চিত্তরঞ্জন মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়াছেন। প্রতি বৎসর বার্ষিক যে সাহিত্য-সম্মিলনী হইত, চিত্তরঞ্জন তাহাতে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। পুরুলিয়ায় তাঁহার পিতার একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। এককালীন তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উহাতে চিত্তরঞ্জন এক বৃহৎ অনাথ-আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, সেই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তিনি মাসিক তিন হাজার টাকা প্রদান করিতেন। চিত্তরঞ্জনের সহোদরা অমলা স্বয়ং অনাথ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হাতে অনাথ, অনাথা, অসহায়, অসহায়া, বধির, খঞ্জ, পঙ্গু, মূক, অন্ধ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতির সেবা করিতেন। কেবল তিলক ফোঁটা কাঁটিয়া ছুঁৎমার্গের সেবা করিলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয় না। ধর্ম্ম-সাধন হয়—নর-নারায়ণের সেবা দ্বারা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

> "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্
> ব্যাধিতস্য ঔষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ"।

সত্যই যে ধনী তাহাকে ধন দান করিয়া ত প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনা হয় না। এই যে আমাদের চতুর্দ্দিকে পরিদৃশ্যমান জগতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক অসংখ্য প্রাণীপুঞ্জ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর কীট হইতে বৃহদাকার প্রাণী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই যে সচ্চিদানন্দরূপী ভগবান বিরাজ করিতেছেন, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া যিনি

জীবের সেবায় কায়মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক—মোক্ষের পথ তাঁহারই জন্য উন্মুক্ত। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মা হ'তে কীট পরমাণু
সেই প্রেমময়
প্রণাম কর হে সখা—
কর সবে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীব-সেবা করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ একদিন উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঘরের ঠাকুর, পথের কুকুর—উভয়কেই সমভাবে পূজা করিতে হইবে, তাই বিবেকানন্দ ভারতে মন্দির ও ভিক্ষুকের সংখ্যা না বাড়াইয়া মঠের প্রতিষ্ঠা করতঃ নর-নারায়ণের সেবক মণ্ডলীকে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দীক্ষা দান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক এ জগতে যাহারা ভ্রান্ত তাহারাই মনে করে এ ব্যক্তি আমার আপন, ও ব্যক্তি আমার পর, যাহারা অজ্ঞ তাহারাই মনে করে এ ব্যক্তি উচ্চ, ও ব্যক্তি নীচ, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। একই ভগবান ভূতাত্মা সর্ব্বজীবের দেহে বিরাজমান থাকিয়া নানা ভাবে প্রকটিত হইতেছেন।

"এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল যন্ত্রবৎ॥
নিত্য সর্ব্বগতোহ্যাত্মা কূটস্থ দোষ বর্জ্জিতঃ।
এক সঃ ভিদ্যতে শক্ত্যা ময়েয়া ন স্বভাবতঃ॥
—শ্রুতি।

একই আত্মা সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, কেবল জলগত চন্দ্রের ন্যায় বহুরূপে দৃষ্ট হন। তিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, কূটস্থ এবং দোষ-বর্জ্জিত। তিনি এক হইয়াও কেবল মায়াশক্তি দ্বারা বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

জল পূর্ণেষু সংখেষু শরাবেষু যথাভবেৎ।
একস্য ভাত্য সংখ্যত্বং তদ্ভেদোহত্র ন দৃশ্যতে॥
—শিবসংহিতা।

বহু সংখ্য জলপূর্ণ শরাবে যেরূপ এক সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু সংখ্য বলিয়া দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েন, এক আত্মাও সেইরূপ মায়াবচ্ছিন্ন হইয়াই বহু সংখ্যক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন। অর্থাৎ সূর্য্য বিম্বের ন্যায় আত্মার দ্বিত্বভাব নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুনতিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্র রূঢ়ানি মায়য়া॥

ঈশ্বর সকল ভূতের এবং প্রাণীর হৃদয়-মন্দিরে স্থিত হইয়া যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভূতগণকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন।

ঈশ্বর যে সর্ব্বভূতেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এটুকু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী

অমলা দেবী বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তিনি পুরুলিয়ার আশ্রমের সেবিকার ভার নিজে গ্রহণ করিয়া অন্ধ আতুরের মূত্র পুরীষ স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। জননী যেমন স্বহস্তে পুত্রের বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করিতে—ভগিনী যেমন ভ্রাতার গলিত ক্ষত ধৌত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, দেবী স্বরূপিণী অমলাও তদ্রূপ অনাথ অনাথাদের নিষ্ঠীবন-পুরীষ পরিষ্কার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

চিত্তরঞ্জন পুরুলিয়ার অনাথ আশ্রম ব্যতীত নদীয়ার নিত্যানন্দ আশ্রমের অনাথ আতুরদের আহার্য্যাদির সংস্থান-কল্পে নিত্যানন্দ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এত বড় বিরাট দানের কথা দেশবাসী—দেশবাসী ত দূরের কথা, তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই। খৃষ্টেরই ন্যায় দক্ষিণ হস্তে দান করিবে বাম হস্তকে জানিতে দিবে না।

ভবানীপুরের অনাথ আশ্রম চিত্তরঞ্জনের বিরাট দান—পরদুঃখ-কাতরতার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। এই আশ্রমের জন্যও তিনি যে কত সহস্র সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন তাহারও ইয়ত্তা নাই।

চিত্তরঞ্জন নিজে সাহিত্যিক ছিলেন, তাই দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। বাঙ্গালায় যিনি সৎসাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই চিত্তরঞ্জনের নিকট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ "মানবের আদি জন্মভূমি" প্রণেতা স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে তিনি বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য মাসিক একশত টাকা করিয়া নিয়মিত বৃত্তি দিতেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি যখন ঋণ-দায়ে বিজড়িত হইয়া "সাহিত্য" পত্র তুলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন তখন চিত্তরঞ্জনই তাঁহাকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস যখন বুভুক্ষার নিষ্পেষণে নিষ্পেসিত হইয়া গাহিয়াছিলেন :—

"ও ভাই বঙ্গবাসি!
আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে পরাণে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌।

তখন এই চিত্তরঞ্জনই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কবি গোবিন্দ দাসকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৺হরিদাস হালদারকে বাসগৃহ-দায় মুক্ত করিতে ৫ হাজার টাকার চেক দিয়াছিলেন। কোন বাংলা সংবাদপত্রকে ৬০ ষাট হাজার টাকা বিনা সুদে ঋণ দান করিয়া যে উপকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কখনই ভুলিতে পারিবেন না নচেৎ অদ্য একটী বিরাট কারবার অনিবার্য্য বন্ধ হইয়া যাইত। ৺বিপিনচন্দ্র পালকে তিনি অনেক সময়ই সুনিয়মিতরূপে মোটা অর্থ দিয়া আসিয়াছেন।

বেলুড় মঠের উৎসবেও মোটা রকম অর্থ দিয়াছেন। দেশীয় কীর্ত্তনের উৎসাহ দানের জন্য দেশবন্ধু ১০০০৲ টাকা করিয়া দিতেন। কলিকাতা পোষ্ট গ্রাজুয়েটএ বাংলা শিক্ষাবিভাগে তিনি মাসিক ২০০৲ টাকা সাহায্য দান করিতেন।

শ্রদ্ধাস্পদ সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন "২৫ হাজার টাকা দান করিয়া একজনের গৃহ বন্ধক মুক্ত করেন। ২।৫ শত টাকা ত অনেককেই কথায় কথায় দান করিতেন। মাসিক সাহায্যও ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত করিতেন, ইহারাই আবার তাঁহাকে গালি না দিয়া জলস্পর্শ করিতেন না।"

দান করিতে করিতে তাঁহার মধুচক্র নিঃশেষ হইয়া গেল। পরিশেষে শাক্যসিংহের ন্যায় বিপুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া দেশযজ্ঞে দধীচির ন্যায় :—

অপুণ্যানি মৃতাস্থীনি ধন্যোহং যস্য তানিমে
গমিষ্যন্ত্যপযোগিত্বং পুণ্যেলোক হিতব্রতে।

প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিলেন। ৺স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পরম বৈষ্ণব মহারাজ ৺মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্যার তারক পালিত, স্যার ৺রাস-বেহারী ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় ইনিও বিরাট বিপুল দান করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ১৪৮নং রসারোডস্থ বৃহৎ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নারীশিক্ষার জন্য ট্রাষ্টির হস্তে দান করিয়া নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার জীবনের আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবন অতি অল্পকালের, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন দেশে কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস তখন স্বচ্ছল, অবস্থাপন্ন উকিল এটর্ণী জমিদার প্রভৃতির অবসর বিনোদনের ও যশ অর্জ্জনের একটা "মজলিস" ছিল মাত্র এবং সেই মজলিসে গুটি কয়েক লোক—বৎসরান্তে বক্তৃতার তুবড়ী ছুটাইয়া বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট কেবল আবেদন নিবেদনের ক্রন্দন করিতেন। এই কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। কেন না ১৮৮৫ সাল হইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছে সেই অধিবেশনে কেবল প্রস্তাব পাশ ও বক্তৃতা করা ছাড়া কংগ্রেসের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় মহামতি দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে যে বিরাট জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে মহামতি দাদাভাই সর্ব্বপ্রথমে জাতিকে স্বরাজের বার্ত্তা শুনান। চিরদিন পরাধীনতার হৈমশৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবাসী দাদাভাইয়ের মুখে "স্বরাজ" কথা শুনিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ মহামতি দাদাভাইয়ের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই কংগ্রেসেই প্রথমে ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক ছাড়া জাতির যাহারা মেরুদণ্ড—যাহাদিগকে

লইয়া জাতি সেই কৃষক শ্রমিক প্রভৃতি যোগদান করিতে আরম্ভ করে। ফলে কংগ্রেসে ক্রমে ক্রমে গণতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে।

১৯০৫ সাল হইতে চিত্তরঞ্জন জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনের সহিত মিশিতে আরম্ভ করেন। কেন করেন? তিনি আজীবন গণতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, স্বৈরাচার তাঁহার চক্ষুশূল ছিল—আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা আদৌ দেখিতে পারিতেন না, কাজেই ১৯০৫ সাল হইতে কংগ্রেস গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তিনি কংগ্রেসের সহিত যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি ও অভ্যর্থনা সমিতি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভায় বাঙ্গালার রাজনীতিকগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদলে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাচীন পন্থীগণ, অন্যদলে চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি। সেই সভায় পুরাতন ও নূতন দলে ঘোর বাদপ্রতিবাদ হইল, ফলে কিন্তু নবীন দলেরই জয়লাভ হইল। তাহার ফলে পরবর্ত্তী বৎসরে সুরাটে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হইল, তখন দেশ এই উদীয়মান গণতন্ত্রবাদীদের প্রভাবই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিল—সুরাটের দক্ষযজ্ঞের অবসানে নিশি প্রভাত হইলে যেমন উদীয়মান তরুণ তপনের ক্ষীণ আভা প্রকাশিত হয়, তেমনি চিত্তরঞ্জনের ভাবী প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইল।

চিত্তরঞ্জনের প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই

জাগিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় এ দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন। স্বাধীনতা সর্ব্বাধীন ও সর্ব্বতোমুখীন—ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা। বরং ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়, সমাজ-নিগড় ভগ্ন হয়, কিন্তু স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

"He (Raja Ram Mohon Roy) was the first io sound the note of freedom in every department of life and in all the different culture that we meet to day in India. He it was who started the reforming activity. He inaugurated the reforms, which in truth gave rise to re action, which again gave rise to further reforms, thus making the nation true to itself till at last it began to love self-consciousness. After the death of Raja Ram Mohon Roy, the work of reform was naturally taken of by the Brahmo Samaj. That movement was nothing but self same note of freedom and culture in religion also. Though the ideal of freedom and culture was sure what followed from European culture and civilisation.

রাজা রামমোহন রায়, সর্ব্বপ্রথমে জীবনের সমগ্র বিভাগে, সকল শিক্ষা ও সভ্যতাকে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেন। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে যে সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে ক্রমে দেশে

প্রতিক্রিয়া জন্মিল, সেই প্রতিক্রিয়া হইতে আবার নূতন নূতন সংস্কারের ভাব জাগ্রত হইলে ক্রমে দেশবাসিগণ আপনার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আত্মবোধ লাভ করিলেন। এই স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষাতে বিলাতে শিক্ষার জন্য বাসকালে দেশের সম্মান রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা করিতেন তাহাতে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির বোমার মামলার সমর্থন করিতে যাইয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল আইন-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক সমর্থন মাত্র নহে, তাহাতে তাঁহার প্রবল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, অকৃত্রিম দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে যখন শ্রীমতী বেসান্তকে গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করেন, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁহার আইন ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়া—হাজার হাজার টাকা ধূলিমুষ্টির ন্যায় ফেলিয়া দিয়া তিনি বাঙ্গালার প্রতি জেলায় জেলায় ঘুরিয়া প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেশবাসীকে সে সময় তিনি স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যখন মণ্টেগু চেম্‌স্‌ ফোর্ড প্রকাশিত হইল, তখন চিত্তরঞ্জন ঐ রিপোর্টে বর্ণিত তথাকথিত দায়িত্বপূর্ণ শাসন সংস্কার (?) মানিয়া লইতে পারিলেন না। তারপর পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, গুজরানওয়ালার অত্যাচার, দেশের দৈন্য দুঃখ আসিয়া জুটিয়া—তাঁহার কোমল প্রাণকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কংগ্রেসের কাজেই, দেশের কাজেই মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। দেশে স্বরাজ স্থাপনের জন্য

মহাত্মা গান্ধী যখন কলিকাতা কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখনও চিত্তরঞ্জন এই প্রণালী সমীচীন মনে করেন নাই। তিনি মহাত্মার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিবার জন্য সদলবলে নাগপুরে গমন করিলেন। একদিন রাত্রিতে কংগ্রেস নগরের একটি কুটীরে মহাত্মার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাৎ হইল। সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের সহিত চিত্তরঞ্জনের কি পরামর্শ হইল না হইল, তাহা জানা যায় না, তবে পরদিন শুনা গেল চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া ফকীর সাজিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কার্য্যতঃও তাহাই হইল। নাগপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিলেন। ফকীরের বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া স্বরাজের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কত যুবক তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইল —চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করিলেন ; কিন্তু সে ইতিহাস পরে বলিব।

১৯০৫সাল হইতে চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিষয়ে যোগদান করিলেও ১৯১৭সালে মণ্টেগু শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি আপন মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই সময় ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে যাইয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি বলেন— "স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতটুকু অধিকার দিবেন এবং কতটুকু দিবেন না, এ সমস্ত ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদের যতটুকু অধিকার প্রয়োজন, আমাদিগকে ততটুকু দাবী করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী পূর্ণ করিবেন কি না তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই।"

ঐ সালে—অর্থাৎ ১৯১৭ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন ইহা লইয়া প্রাচীনপন্থী দল ও নূতন দলে মত বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রাচীনপন্থী দল মামুদাবাদের রাজা বাহাদুরকে আর নবীনপন্থী দল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে একবাক্যে শ্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল, অবশেষে চিত্তরঞ্জনেরই জয় হইল। তদবধি চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার অবিসম্বাদী প্রধান নেতৃত্বের আসনে অভিষিক্ত হইলেন।

১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের প্রতিবাদের জন্য মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করেন। একদিকে পঞ্জাবের হাঙ্গামা, তার উপর খেলাফতের বেদনা—তার উপর কংগ্রেসের কর্ম্মীদের উপর নির্য্যাতন দেখিয়া দেশবাসী একেবারে আমলা-তন্ত্রের শাসন-পদ্ধতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আমলাতন্ত্রের এই সব অনাচারের কোনপ্রকার প্রতীকারের উপায়ান্তর না দেখিয়া আমলা-তন্ত্রের সহিত **সহযোগিতা** বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

১৯২০ সালে এই অসহযোগ নীতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে বিশেষ কংগ্রেসের (Special Congress) অধিবেশন হইল। সেই মহাসভায় চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ টিকিল না, ফলে ভোটের আধিক্য বশতঃ মহাত্মা গান্ধীর জয় হইল। চিত্তরঞ্জন কিন্তু কংগ্রেস ছাড়িলেন না।

অসহযোগে চিত্তরঞ্জন

স্পেশাল কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি দেশবাসীর অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিতেন, দেশের লোক মহাত্মা গান্ধীর বাণী ঠেলিয়া ফেলিয়া কখনও চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও দেশবন্ধু মহাত্মার অসহযোগ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ এখনও এমন ত্যাগী হইয়া উঠে নাই যে তাহারা সকলে অসহযোগ ব্রত আরম্ভ করিবে, সুতরাং যাহা কখনও বাস্তবে পরিণত হইতে পারিবে না, তাহার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা কখনও সমীচীন নহে। স্পেশাল কংগ্রেসেব সভাপতি লালা লজপত রায় পর্য্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই উক্তিব সমর্থন করিলেন, কিন্তু করিলে কি হয়? তখন দেশে মহাত্মা গান্ধীব প্রাধান্য, প্রভাব ও ক্ষমতা অপরিমেয়, ভারতের লোক তখন অবিচারিত চিত্তে মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করে, কাজেই চিত্তরঞ্জনের আপত্তি কোনরূপে টিকিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কিছুতে স্বমত ছাড়িলেন না। তিনি করতালি লাভের আশায় স্বদেশীসাধনা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, যাহা তিনি সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহারই প্রচাবার্থে—সেই সত্যের সাধনার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন গতানুগতিকের অনুসরণ করিবাব পাত্র নহেন।

কিন্তু পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটিতে যাইয়া চিত্তরঞ্জনের মন পরিবর্ত্তিত হয়। রোরুদ্যমান্ লাঞ্ছিত নিপীড়িতদের করুণ মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া চিত্তরঞ্জন ক্রমে ক্রমে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগনীতির পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তিনি বুঝিতে পারেন, যে গভর্ণমেণ্ট জেনারেল ডায়ারের মত লোককে পেন্‌সন্ দিয়া বিদায় দিতে পারে, যে গভর্ণমেণ্ট স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের লাটের কার্য্যেব সমর্থন করে, সেই গভর্ণমেণ্টের দ্বারা ভারতের কোন কিছু হইবার আশা নাই। অসহযোগই এই গভর্ণমেণ্টকে সুপথে আনিবার একমাত্র উপায়। এই সত্যটুকু তিনি পাঞ্জাবে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের তদন্ত কমিটিতে কাজ করিবার পর উপলব্ধি করিতে পারেন। শুনা যায়, ঐ তদন্ত কমিটিতে এক একটি নির্য্যাতিতা নারী যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কমিটির কাছে জেনারেল ডায়ারের পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল তখন কখনও সমবেদনায় চিত্তরঞ্জনের দু'নয়ন ভাসিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল, কখনও তিনি রাগে ফুলিয়া উঠিয়াছিলেন, কখনও বা—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া জেনারেল ডায়ারের পৈশাচিক কাণ্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতে-ছিলেন। এই পাঞ্জাব-জালিয়ান ওয়ালাবাগের তদন্ত কমিটিতে তিনি প্রায় মাসাবধিকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন কমিটির অন্যান্য সভ্যগণেব ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন তখনও ব্যারিষ্টারী ত্যাগ কবেন নাই, কাজেই এ সময়ে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারীতে যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কলিকাতা হইতে

মুহুর্মুহুঃ তার যাইতেছিল, দৈনিক দুই হাজার পর্য্যন্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া অনেক মক্কেল তাঁহাকে তার করিতেছিল, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের পরদুঃখকাতর প্রাণ কিছুতেই টলিল না। বস্তুতঃ এই জালিয়ানওয়ালাবাগের তদন্ত কমিটি হইতেই চিত্তরঞ্জনের ভাবী বিরাট ত্যাগের সূত্রপাত হয়, এই সময় হইতেই ভারতজননীর পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচন করিবাব দৃঢ় সঙ্কল্প চিত্তরঞ্জনের জীবনকে অধিকার করে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা কি? কেন সেজন্ত তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল সেই কথাটাই আগে বলি। জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবের অমৃতসরের একটি উন্মুক্তস্থান, চারিপার্শ্বে তাহার প্রাচীর। বাহির হইবার ও ভিতরে যাইবার মাত্র ২।১টী ছোট দরজা। এই বাগে পাঞ্জাবের কয়েক সহস্র লোক একটি সভার অধিবেশন করে। জেনারেল ডায়ার নামক এক সৈনিক পুরুষ এই বাগের অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বাগ হইতে বাহির হইবার অবকাশমাত্র না দিয়া যতক্ষণ তাঁহার কামানে গুলি ছিল ততক্ষণ গুলি করেন। ফলে কত লোক যে হতাহত হয় তাহার স্থিরতা নাই—কত লোককে যে মাটিতে পুতিয়া ফেলা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। জেনারেল ডায়ার হতভাগ্যদের কোনরূপ সাহায্য না করিয়া —কাহাকেও হাঁসপাতালে না পাঠাইয়াই নিজের তাণ্ডবলীলা স্থল হইতে সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রস্থান করেন।

জেনারেল ডায়ারের কৃতকার্য্যের তদন্তের জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির সদস্য হনঃ—(১) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, (২) মৌলবী ফজলুল হক, (৩) চিত্তরঞ্জন দাশ,

(৪) মিঃ আব্বাস তায়াবজী, (৫) শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

মৌলবী ফজলুল হক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া সদস্য পদ ত্যাগ করায় বোম্বাইয়ের মিঃ জয়াকর সেই স্থানে নিযুক্ত হন।

সেবার অমৃতসরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে পাঞ্জাবী অনাচার, খেলাফত সমস্যা, শাসনসংস্কারের নিয়ম, সহযোগিতা বর্জ্জন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তারপর নাগপুরের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন নিজেই অসহযোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তিনি প্রারম্ভেই বলেন, "আমরা—যে সব অনাচার-পীড়িত, সে সকলের প্রতীকার জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত আমরা প্রতীকারের যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সে সব ব্যর্থ হইয়াছে; কাজেই আমাদের পক্ষে অহিংস অসহযোগ ব্যতীত অন্য পথ নাই। সুতরাং আমরা অসহযোগের কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া স্বরাজ লাভে চেষ্টিত হইব। সেজন্য দেশের সকল শ্রেণীর লোককে প্রস্তুত হইতে হইবে। এ দেশে যে আমলাতন্ত্র শাসন চলিতেছে, কে তাহা চালাইতেছে? এ দেশের লোকেব সাহায্যে বিদেশী আমলারা তাহা চালাইতেছেন। সুতরাং কংগ্রেস বসিলে দেশের লোককে শাসনযন্ত্র পরিচালনের সাহায্যে বিরত হইতে হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী নিজে এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

নাগপুব হইতে ফিরিয়া আসিবার পর চিত্তরঞ্জন সর্ব্বোতোভাবে ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করেন এবং রাজনীতি চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

কারাগারে চিত্তরঞ্জন

পর বৎসর—বড়লাটের আমন্ত্রণে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতে আগমন করেন। দেশের নেতৃগণ ঘোষণা করেন, কেহ যেন যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদান না করেন। এই ব্যাপার লইয়া দেশময় একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দেশবন্ধুর ন্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পুত্র, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতিও দেশের কার্য্যে মাতিয়া যান। চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হন। চিররঞ্জনের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া চিত্তরঞ্জনের পত্নী—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ভগিনী—শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী সুনীতি দেবী গ্রেপ্তার হন। সরকার স্বেচ্ছা-সেবক সঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১০ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হন। চিত্তরঞ্জনের গ্রেপ্তার সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইবা মাত্র চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়,—সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিয়া দেশবাসী সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সময় কলিকাতায় আসিয়া কারাগারে চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বড়লাটের সহিত গোল টেবিলের পরামর্শ (Round Table Conference) করিবার জন্য কারাগারে চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করেন যে, সরকার যদি অন্যায় ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেন, চণ্ড নীতিমূলক প্রস্তাব সমূহ প্রত্যাহার করেন এবং দেশের লোকের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসননীতির পরিবর্ত্তন

করেন, তাহা হইলে গোল টেবিলের অধিবেশনে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই।

পণ্ডিত মদনমোহন এই মর্ম্মে মহাত্মাকে তার করিয়া জানান যে, গোল টেবিলের পরামর্শ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তিনি আইন অমান্য বন্ধ রাখেন এবং যুবরাজের অভ্যর্থনা বন্ধ রাখিবার জন্য সভা-সমিতি ও হরতাল স্থগিত রাখেন।” মহাত্মা এই তারের উত্তরে জানান, “সরকারের দমন নীতির জন্য ব্যস্ত হইবেন না। সরকার যদি সত্য সত্যই অনুতপ্ত না হন, পঞ্জাব ব্যাপারের, খেলাফতের ও স্বরাজের সুমীমাংসা করিতে আগ্রহান্বিত না হন, তাহা হইলে গোল টেবিলের পরামর্শ সভা নিষ্ফল হইবে।”

তখন কারাগার হইতে চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯শে তারিখেই মহাত্মা গান্ধীকে তার করেন—

“আমরা নিম্নলিখিত সর্ত্তে হরতাল বন্ধ করিতে বলি ;—(১) কংগ্রেস কর্ত্তৃক উত্থাপিত সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য সরকার শীঘ্র সভার আহ্বান করিবেন, (২) সরকার সম্প্রতি প্রকাশিত সকল ইস্তাহার ও আদেশ প্রত্যাহার করিবেন, (৩) নূতন আইনে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দান করা হইবে। অবিলম্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট উত্তর দিবেন।”

উত্তরে মহাত্মা গান্ধী তার করেন—কাহাদিগকে সভায় ডাকা হইবে, তাহা যদি পূর্ব্বাহ্নে স্থির হয় এবং ফতোয়ার জন্য ও করাচীতে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে হরতাল বন্ধ করা যাইতে পারে।”

শেষে বড়লাট লর্ড রেডিং গোল টেবিলের পরামর্শে সম্মত না হওয়ায় পণ্ডিত মালব্যের প্রস্তাব বাতিল হয়।

আমেদাবাদ কংগ্রেস

সেবার আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা। চিত্তরঞ্জনকে সেই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারাগারে যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অভিভাষণের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়া মহাত্মার নিকট প্রেরণ করেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন উপস্থিত হইতে না পারায় হাকিম আজমল খাঁকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। খাঁ সাহেব অভিভাষণ পাঠ করিবার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ পাঠ করেন। সেই অভিভাষণের সারাংশ এইরূপ :—

"আমাদের পক্ষে অসহযোগ ব্যতীত যুদ্ধের অন্য কোন উপায় নাই এবং কংগ্রেসের দুইটি অধিবেশনে আমরা অসহযোগই উপায় জ্ঞানে অবলম্বন করিয়াছি। আমরা অসহযোগী ; সুতরাং আপনাদের কাছে ইহার স্বরূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই। মিষ্টার ষ্টোকস্ বলেন, "প্রতিষেধ সাধ্য অন্যায়ে সম্মত হইতে অস্বীকার করাই অসহযোগ। অবিচার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা, প্রতীকারসাধ্য অনাচারে অসম্মত হওয়া, যাহা ন্যায়ের বিরোধী, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, এবং

যাহারা অনাচার করে, তাহাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে অস্বীকার করা—ইহাই অসহযোগ'।"

চিত্তরঞ্জন বলেন, অসহযোগ হতাশার নহে—ইহার ফলে আমরা জয়ী হইব। তিনি ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যাহারাই ত্যাগী তাহারাই জয়ী হইবে,—জাতীয় জীবনের অন্ধকারে তাহারাই আলোকের বর্ত্তিকা বহন করিয়া যাইতেছে—তাহারা মুক্তির পুণ্য তীর্থযাত্রী। চিত্তরঞ্জন যে তাঁহার অভিভাষণের খসড়া পূর্ব্বাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আরম্ভে তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতায় সরকারের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে—লোককে ভয় দেখাইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদানে বাধ্য করিতে সরকার রাজনীতিক জীবনের শ্বাসরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আমি অপরিসীম উৎসাহ লইয়া আসিয়াছি—এই সংগ্রাম শেষ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছি।"

তিনি "মুক্তি"র ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—স্বাধীনতা বা মুক্তি সর্ব্ববিধ সংযমের অভাব নহে; পরন্তু যে অবস্থায় জাতি তাহার স্বতন্ত্র স্বরাজ লাভ করিতে ও স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সেই অবস্থায়ই মুক্তি বা স্বাধীনতা। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, বহু জাতি তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তা অক্ষুন্ন রাখিতে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডে পোল্যাণ্ডে আয়ারল্যাণ্ডে, মিশরে ও ভারতবর্ষে এই চেষ্টা প্রকট। প্রথমে জাতি তাহার শিক্ষাব্যবস্থাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ বিদেশী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে; তাহার পর লোক জাতীয়

শিক্ষা চাহে—শেষে বিদেশীর প্রভাব মুক্ত হইয়া আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের বলবতী বাসনা আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা যখন আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিব, তখন আমরা প্রয়োজন বুঝিয়া অন্যান্য দেশের ভাব গ্রহণ করিব ; তাহার পূর্ব্বে নহে। গৃহ না থাকিলে কেহ কি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে পারে ? রাজনীতিক পরাভবের ফলে আমাদের শিক্ষাদীক্ষাগত পরাভব ঘটিয়াছে। তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নহিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। আমরা দাসের জাতিতে পরিণত হইতেছি। ভারতের প্রাণ পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গ্রামবাসীরা পরিশ্রমী ও নির্ভীক, কিন্তু তাহাদের ললাটে পরাধীনতাজনিত দুর্দ্দশা অনপনেয়ভাবে অঙ্কিত। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে কোটী কোটী টাকা বিদেশে যায়, আমরা তাহার বিনিময়ে যৎসামান্যই লাভ করি, আমরা বিজেতাদের ভাষা ব্যবহার করি, তাহাদের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে ব্যগ্র হই। বুরোক্রেশীর সহিত সমরে আমরা ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারি :—

(১) সশস্ত্র প্রতিরোধ (২) ভারত-শাসন আইনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভাদিতে ব্যুরোক্রেশীর সহিত অসহযোগ (৩) অহিংস অসহযোগ।

প্রথম উপায় অবলম্বন করিবার কল্পনাও আমরা করি না। দ্বিতীয় উপায় কিরূপে অবলম্বিত হইতে পারে ? ভারতশাসন আইনের মুখবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যায় :—

(১) ভারত শাসনলাভে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যে অন্যান্য জাতির সহিত

তুল্যাসনলাভে যে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার আছে, সে কথা পার্লামেণ্ট স্বীকার করেন নাই।

(২) ভারতবাসীর সেই তুল্যাধিকার স্বীকার করিতে পার্লামেণ্ট বাধ্য নহেন। (৩) কতকালে এবং কি ভাবে ভারতবাসীর অধিকার বিস্তার করা যাইবে, এই দেশের অবস্থা-ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ বৃটিশ পার্লামেণ্ট তাহা স্থির করিবেন।

(৪) আমরা নাবালক—বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদের অভিভাবক।

ইংরাজ যদি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করেন, তবেই ইংরাজের সহিত সহযোগ করিতে সম্মত হইব—নহিলে নহে। যে জাতি আমাদের দেশাত্মবোধের পথ বিঘ্নবহুল করে, সে জাতি আমাদের মিত্র নহে। আমরা ব্যবস্থাদির সামান্য ব্যাপারে ইংরাজের সহিত আপোষনিষ্পত্তি করিতে পারি, কিন্তু মূল ব্যাপারে তাহা হইতে পারে না। আমরা মুক্তি চাহি—মুক্তি লাভই আমাদের কাম্য। আমরা সেইজন্য চেষ্টা করিব—যদি পরাভূত হই—তবুও আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে না।

এখন দ্রষ্টব্য—শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের আরম্ভ হইয়াছে কিনা? ব্যবস্থাপক সভার ব্যয়ের উপর কোন কর্তৃত্ব আছে কিনা? আইনের নির্দ্ধারণ—গভর্ণর শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সহিত একযোগে সংরক্ষিত বিভাগ সমূহের কার্য্য করেন। কর, ঋণ ও রাজস্ব ব্যয়ের প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে সকলের একযোগে পরামর্শ করিবার ব্যবস্থা নাই। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য

সংরক্ষিত বিভাগ সমূহের প্রয়োজন অত্যধিক—সে বিভাগ সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। সরকারের সহিত জনগণের যে সংগ্রাম চলিতেছে, মন্ত্রীরা নীরবে তাহা দেখিবেন মাত্র। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে দেশে চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হইবে কিনা সে বিষয়ে বিচার কালে তাঁহারা সরকারের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইবে কিনা, সে বিষয় বিচার কালে তাঁহারা সরকারের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবেন না; মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইবে কিনা, সে বিষয়ে সরকার তাঁহাদের মত গ্রহণ করিবেন না। গভর্ণর ও শাসন-পরিষদের ইংরাজ সদস্যেরা একমত হইলে সংরক্ষিত বিভাগে শাসন-পরিষদের দেশীয় সদস্যেরাও কিছু করিতে পারেন না।

কোন্ "বিষয়ের" ভার যে মন্ত্রিগণের উপর প্রদত্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না; কেবল কয়টী "বিভাগ" হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু শতবর্ষব্যাপী ব্যুরোক্রেটীক শাসনে যে সব দায়িত্ব সৃষ্ট হইয়াছে—সে সবই রহিয়া গিয়াছে; মন্ত্রীরা সেই সব লইয়া বিব্রত হইবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগের কথা ধরা যাউক। এই দুই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার পাইলে মন্ত্রীরা অনেক কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভার তাঁহারা পান না। কারণ, তাঁহারা সেই সব বিভাগে কর্ম্মচারী বাছিয়া লইতে বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন না। ভারতে ব্যুরোক্রেটীক শাসনের বৈশিষ্ট্য—যখনই ভারতবাসী তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু চাহিয়াছে, তখনই সরকার তাহার

পরিবর্ত্তে ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা, ব্যয়সাধ্য গৃহ প্রভৃতি দিয়াছেন। মন্ত্রীরা বলিতে পারেন না—তাঁহাদের বিভাগটীর আমূল পরিবর্ত্তন করিবেন, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস তুলিয়া দিয়া দেশীয় লোকের দ্বারা কার্য্য চালাইবেন। তাঁহারা যদি কোন সঙ্কটে অধিক সংখ্যক ডাক্তার চাহেন অমনই বলা হয়—"ডাক্তার নাই" কোথায়ও ব্যাধি-বিস্তার হেতু তাঁহারা চিকিৎসক পাঠাইলে মেডিকেল বিভাগ বলিতে পারেন—"আমরা ইহাদের বেতন দিব না।" একজন মন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছেন, তাঁহার অর্থ নাই, তাহাতে সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেন না। ব্যবস্থাপক সভারও খরচের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। কোন মন্ত্রী বলিয়াছেন—এ দেশে মন্ত্রীরা বিলাতের মন্ত্রীর মত ক্ষমতাশালী বলিয়াই লোক মনে করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা শাসনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দত্ত অর্থ মাত্র লইয়া কাজ করেন। আইনে আছে, শাসন পরিষদের সদস্যরা ও মন্ত্রীরা একযোগে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগের খরচ মঞ্জুর করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইলে গভর্ণর যাহা স্থির করিয়া দিবেন, তাহাই হইবে। কোন্ বাবদে কত খরচ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার অধিকার ব্যবস্থাপক সভার নাই।

(১) আইনটী আলোচনা করিলে দেখা যায় :—সভ্য সরকারের অধীনে প্রজা যে সব প্রাথমিক অধিকার সম্ভোগ করে, এ আইনে আমাদের সে সব অধিকারও স্বীকৃত হয় নাই।

(২) দেশের লোকের মত না লইয়াই সরকার চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারেন।

(৩) দেশের লোক চণ্ডনীতিদ্যোতক আইন নাকচ করিতে পারেন না।

(৪) শাসন-সংস্কারের ফলে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অনাচারের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হয় নাই। এসব বিষয়েই আমাদের অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

মন্ত্রীদিগকে এইরূপ ব্যবস্থায় কাজ চালাইতে হয়; আর মডারেটরা বলেন, এই ব্যবস্থায় এ দেশে স্বরাজের সূচনা হইয়াছে। ভারত-শাসন আইন সরকারের সহিত সহযোগের ভিত্তিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ভারতবাসী অসম্মানজনক শান্তি চাহে না, যতক্ষণ ভারত-শাসন আইনের মুখবন্ধ বিদ্যমান থাকিবে এবং আমাদের আত্মকার্য্য নিয়ন্ত্রণের আত্মবিকাশের ও আত্মবোধের অধিকার অস্বীকৃত রহিবে, তত দিন মিটমাটের কথা উঠিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের পক্ষে যুদ্ধের একমাত্র উপায়—**অসহযোগ।** অসহযোগে বিচ্ছেদ বুঝায় না। ইংরাজ—ইংরাজ বলিয়াই, আমরা তাহার সহিত অসহযোগ করিব না। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান এবং বৈচিত্র্য অনন্তের লীলা মাত্র। জগতে সকল জাতিকে স্ব স্ব বৈচিত্র্যের স্ফুর্ত্তির দ্বারা ঐক্য সাধন করিতে হইবে, তবেই মনুষ্যজাতির উন্নতি সাধিত হইবে! ভারতবাসী ইংরাজ বলিয়াই ইংরাজের সহিত অসহযোগে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু যে কোন জাতি বা প্রতিষ্ঠান তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের বিরোধী হইবে, সে তাহারই সহিত অসহযোগ করিবে। জাতীয় শিক্ষা বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নহে। তাহার উদ্দেশ্য অতীতের সহিত সংযোগরক্ষণ ও আমাদের জ্ঞানকে আমাদের মনোরাজ্যে

প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা দেশবাসীকে বলি—"প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে উপেক্ষিত দীপ প্রজ্বলিত কর—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর। তাহার পর নির্ভীক ভাবে জগতের সম্মুখীন হও এবং বাহির হইতে যে আলোক পাইতে পার, তাহা গ্রহণ কর।" মিষ্টার ষ্টোক্‌স্ বুঝাইয়াছেন, প্রতিবোধ সাধ্য অন্যায়ে সাহায্য করার নাম অসহযোগ। যাহারা সুযোগের নামে অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত এক যোগে কার্য্য করিতে অস্বীকার করাও অসহযোগের অঙ্গ।

আমরা যে ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সে কেবল গঠনের উদ্দেশ্যে। আজ যাঁহারা দেশ-সেবার জন্য লাঞ্ছনা সহ্য কবিতেছেন, তাঁহাদের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। মৌলনা সৌকত আলি ও মৌলনা মহম্মদ আলি যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। বীরকেশরী লালা লাজপত রায় যে ব্যুরোক্রেশীর আদেশ অমান্য করিয়া কারাগারে গিয়াছেন, সে তেজ ব্যর্থ হইবার নহে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া যে আদেশ তাঁহাকে দাসত্বে লইবে, তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন—সে কি ব্যর্থ হইতে পারে? তাঁহারা আমাদের জয়যাত্রার পথি-প্রদর্শক—তাঁহাদের আদর্শের বর্ত্তিকালোক আমাদিগকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

আমরা উপযুক্তরূপে সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে এবং আমাদের অনুষ্ঠানের স্বরূপ লোক না বুঝিলে আমাদের সাফল্য সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমাদের মত প্রচার কালে বোম্বায়ে হাঙ্গামা হইয়াছে। আমরা

তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিব এবং স্বীকার করিব, সেই পরিমাণে আমাদের সাফল্য লাভ ঘটে নাই, কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কোথায়? জনগণের কাছে আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে। জগতে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানেই চাঞ্চল্য ও রক্তপাত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু সেই জন্য কি কখনও মত প্রচারে বিরত হওয়া সঙ্গত? হয় ত কেহ কেহ বলিবেন, বোম্বাইয়ে যখন হাঙ্গামা হইয়াছে, তখন আমাদের কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন, কিন্তু সমগ্র ভারতে একটি মাত্র হাঙ্গামায় সে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন হয় না। নানাস্থানে নেতৃগণের অবরোধে যে জনগণ বিচলিত হয় নাই—শান্তিভঙ্গ হয় নাই, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—লোক অহিংস—অসহযোগের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। দেশবাসী সাহসের ধৈর্য্যের ও সংযমের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—আমাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী।

ব্যুরোক্রেশী যে আমাদের অনুষ্ঠানের সাফল্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তনেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কংগ্রেস অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কংগ্রেস যুবরাজের এ দেশে আগমনের উৎসবাদি বর্জ্জন করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকে আইন-ভঙ্গ বলা যায় না; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদিগের সাহায্য ব্যতীত এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারেনা। ব্যুরোক্রেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এইরূপে ব্যুরোক্রেশী কংগ্রেসকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় দেশবাসী যদি সরকারের নির্দ্ধারণ স্বীকার না করিয়া কারাবরণ করে, তবে

তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কোথায়? প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যুরোক্রেশীই আইন ভঙ্গ করিয়াছে। যতক্ষণ লোক বক্তৃতায় বা কার্য্যে সাধারণ আইনের বিরোধী কার্য্য না করে, ততক্ষণ তাহাকে সেরূপ কার্য্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই আইন ভঙ্গ করা। সভা যতক্ষণ বে-আইনী না হয়, ততক্ষণ তাহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করাই বে-আইনী কাজ।”

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী

১৯১৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন আপন অভিভাষণে বলেন—“জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পল্লী বা গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সব গ্রামের ১৬ বৎসরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলে এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে। এই সম্প্রদায়ের সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচিত করিবেন। এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামের সমস্ত কার্য্য—সমস্ত শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা গ্রামে পূর্ব্বেকার যাত্রা, গান ইত্যাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন। নৈশবিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। চাষীকে আবশ্যক মত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যকীয় পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষীরা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যক দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্যান্য শিল্পপণ্য উৎপন্ন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লী সমাজ প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষীমাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল কিছু কিছু করিয়া দিবে। পল্লীসমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লীসমাজ চাষীদের প্রয়োজন মত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে। এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা— উপস্থিত হইলে উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া মহকুমা ও জেলা জজের আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত বিবরণই সমস্ত আদালতে নালিশ ও আর্জ্জি বলিয়া গৃহীত হইবে।

এইরূপ প্রত্যেক জেলার জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি কি ২৫টি পল্লী সমাজ থাকিবে। এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চায়েত ছাড়া জেলা-সমাজের জনসংখ্যার অনুপাতে পাঁচজন হইতে পঁচিশ জন

পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। পল্লীসমাজের প্রতিনিধি লইয়া জেলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পল্লীসমাজ জেলাসমাজেরই অধিনায়কত্বে সকল কার্য্য অনুসন্ধান করিবে। জেলা সমাজ নিম্নলিখিত কাজ করিবেন।

(১) আপন জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য তদন্ত করিবেন।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীর শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীন সেই সব গ্রাম আবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী তাহারও স্বাস্থ্য রক্ষার ভার জেলাসমিতির অধীন থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোটখাট ব্যবসা চালাইতে হইবে।

(৬) এই জেলা সমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীর শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের

জন্য অর্থের সুবিধার জন্য মামুলী লোন অফিসের পরিবর্ত্তে এক একটি আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই এক একটি করিয়া থাকিবে। চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে, এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) জেলা ও পল্লীসমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক বসাইয়া আবশ্যক টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(৯) পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের এই সমস্ত কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যক আইন করিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জনের উপরোক্ত বক্তৃতাপাঠে জানা যায়, ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগীতা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নাগপুরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়। নাগপুরেই তিনি ঐ বৎসর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ

অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশবন্ধুচিত্তরঞ্জন নিজের কর্ম্মশক্তিকে কলিকাতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিলেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই মাসিক ৪০।৫০ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিলেন। দেশ তাঁহার অসাধারণ ত্যাগে একেবারে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইল। এত বড় ত্যাগ বাঙ্গালী অনেকদিন দেখে নাই; দেশের জন্য এত বড় বিরাট নিস্পৃহতা জগৎ বহুদিন প্রত্যক্ষ করে নাই, তাই যেদিন দেশবন্ধু ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিলেন, দেশবাসী সেদিন কল্পনা-নয়নে ভারতের একজন যুগাবতারের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল। বাঙ্গালী ত দূরের কথা—অনেক উচ্চ পদস্থ শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার ত্যাগে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল। ইউনিভার্সিটী কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার চিত্তরঞ্জনের এই বিরাট ত্যাগ দেখিয়া বলিলেন—"চিত্তরঞ্জনের এরূপ বিরাট ত্যাগ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়, কোনও দেশে কোনও কালে কেহ এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহা দেশের কার্য্যে ব্যয় করিতে পারে নাই, ভারতবাসী তাঁহার ত্যাগের অনুসরণ করিতে পারিলে ধন্য হইবে।"

ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিবার পর চিত্তরঞ্জন খদ্দরে বিভূষিত হইয়া সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শঙ্কর-শিষ্য শতানন্দের প্রতি

পাদক্ষেপে যেমন বারাণসী-পাদ-প্রক্ষালনী জাহ্নবীর বক্ষে একটির পর একটি করিয়া শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্রূপ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সময় বঙ্গের যেখানেই যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই এক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেশ তাঁহার বিরাট ত্যাগে এরূপ মোহিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যাহা বলিতেন তাহা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। চিত্তরঞ্জনকে সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার পল্লীবাসীগণ যেরূপ বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিল তাহা কোন রাজা মহারাজার ভাগ্যেও এ পর্য্যন্ত জুটে নাই। নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জনের কথামত তথায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় ও ঢাকায় চিত্তরঞ্জনের গমনে একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। ঢাকা হইতে চিত্তরঞ্জন ময়মনসিংহে গেলেন। তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চিত্তরঞ্জনকে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। সারাদিন ষ্টেশনের বিশ্রামগৃহে চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চিত্তরঞ্জন একবার ইচ্ছা করিলেন যে তিনি আইন ভঙ্গ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, কিন্তু তখনও কংগ্রেস আইন অমান্য (Civil disobedience) সমর্থন না করায় চিত্তরঞ্জন অগত্যা ময়মনসিংহ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনায় সমগ্র বঙ্গদেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন বড় দুঃখে ও ক্ষোভে এই ময়মনসিংহ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াই বলিলেন "আমরা আমাদের নিজের দেশে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার পাইতেছি, স্বরাজ না পাইলে জীবনধারণ মিথ্যা।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশে ক্ষুণ্ণ হইয়া তথাকার অধিকাংশ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিল না, উকীল মোক্তারেরা চিত্তরঞ্জনের

অবমাননাকে জাতির অবমাননা মনে করিয়া সাত দিন আদালতে যাওয়া বন্ধ করিলেন—পরিশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে নিজের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন আর ময়মনসিংহে প্রবেশ করিলেন না। তথা হইতে তিনি টাঙ্গাইলে গেলেন। টাঙ্গাইলে চিত্তরঞ্জন একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতা এরূপ প্রাণস্পর্শী, হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে পুলিশ রিপোর্টারেরা পর্য্যন্ত অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারে নাই। টাঙ্গাইল হইতে চিত্তরঞ্জন করটিয়ায় যান। করটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ওয়াজেদ আলি খাঁ ওরফে চাঁদ মিয়া তখন অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীর বিশাল প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা হয়। সে সভায় চিত্তরঞ্জন কৃষককুলকে লক্ষ্য করিয়া যে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ভদ্রসন্তানও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অতঃপর চিত্তরঞ্জন মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় মোহতন্দ্রাগ্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রাণে একটা নূতন জাগরণের সুর বাজিয়া উঠিল। পূর্ব্ববঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের সুরু হইতেই দেশমাতৃকার সেবায় অগ্রবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমার, অম্বিকাচরণ আনন্দচন্দ্র, যাত্রামোহনের প্রভাব পূত স্বদেশী আন্দোলনে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এইবার দেশবন্ধুর মৃতসঞ্জীবনী বক্তৃতায় তাহাদের প্রাণে আরও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। যে ত্যাগী, যে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত—তাঁহার বক্তৃতায় যুগে যুগে দেশে এইরূপই জাগরণের সাড়া পড়িয়া থাকে। বুদ্ধের আহ্বানে

শত শত নৃশংস—অশোক অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল। চৈতন্যের আহ্বানে শত শত কাপালিক নরহত্যা ছাড়িয়াছিল। এ যুগেও তিলকের আহ্বানে যেমন মহারাষ্ট্র জাগিয়াছিল, তেমনি দেশবন্ধুর আহ্বানে পূর্ব্ববঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী বুঝিল এবার ভারতকে মুক্তিদান করিতে সত্য সত্যই একজন প্রতিজ্ঞার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ত্যাগের বহ্নিদহনে নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া আজ কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই পূর্ব্ববঙ্গে চিত্তরঞ্জনের ভ্রমণ বিফলে গেল না। নানাস্থানে কংগ্রেস কমিটি, খদ্দর সমিতি, জাতীয় বিদ্যালয়, সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল—চিত্তরঞ্জন সাফল্য মণ্ডিত হইয়া বিজয়-গৌরবে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স

এইরূপে সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া চিত্তরঞ্জন বরিশাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হন। সেই কন্‌ফারেন্সে ৺ বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই কন্‌ফারেন্সে দ্বিতীয়বার দেশমান্য ৺ অশ্বিনীকুকার দত্ত মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বরিশালে প্রথম প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার একবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জলদগম্ভীরনাদে স্বদেশী যজ্ঞে দেশবাসীকে ধনৈশ্বর্য্য

আহুতি দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেবার দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ উপাসক ৺এ রহুল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তখন মিঃ এমার্সন বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্। কলিকাতা হইতে ৺স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৺ মৌলবী লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি নেতৃ-গণ কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে যান। যেদিন কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন, সেইদিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ইমার্সন একখানি নোটীশ জারি করিয়া কন্‌ফারেন্স বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন। ইহাতে স্বেচ্ছাসেবকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। পুলিশের লোক রেগুলেশন লাঠি লইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রহার করে। কোন কোন স্বেচ্ছাসেবক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পুলিশের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে। সেই মহাসঙ্কটকালে বরিশাল জননায়ক ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় যথোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। তিনি যদি সেই সময়ে কোনরূপ ক্রোধের পরিচয় দিতেন তাহা হইলে বরিশালে সেদিন একটা রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইত। বরিশালের লোক তাঁহার কথায় উঠিত বসিত, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় লোকে ভক্তি করিত, কিন্তু ভবিষ্যৎদর্শী অশ্বিনীকুমার তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে হিংসার দ্বারা কখনও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। যদি ভারত কখনও আমলাতন্ত্রকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহা প্রেমের দ্বারা—অহিংসার দ্বারাই হইবে। তাই তিনি পুলিশের সমস্ত নির্য্যাতন ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাসেবক-

গণকে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ আনতশিরে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী ও বরিশালবাসী গ্রহণ করিল। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাঙ্গালার জননায়ক। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ইমার্সনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাঙ্গালোতে গেলেন। সেদিন রবিবার, কাচারী বন্ধ। সুরেন্দ্রনাথ মিঃ ইমার্সনের বাটীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি তাঁহার বাটীতে গিয়া চেয়ারে উপবেশন করায় মিঃ ইমার্সন তাঁহার ৪ শত টাকা জরিমানা করিলেন। ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াই অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পরিত্যাগ করিলেন। এইভাবে বরিশালের প্রথম কন্‌ফারেন্স শেষ হয়। এই ইমার্সনই ৺সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রীত্ব কালে তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া তাঁহার হুকুম তামিল করিয়াছেন।

তারপর দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হয়। এ কন্‌ফারেন্সে ৺বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অসহযোগনীতি প্রচার করিতে করিতে অবশেষে বরিশাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হন। এই কন্‌ফারেন্সে তিনি সভাপতির মুখে যে আশার বাণী শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় গিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সভাপতি মহাশয় দেশমতের বিরোধী কথাই বলেন। তিনি অসহযোগের বিপরীত মত প্রকাশ করেন। জাতীয় শিক্ষা—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হওয়া অসম্ভব এই কথা বলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই কন্‌ফারেন্সে নিজের জ্বালাময়ী

ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অসহযোগের মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র সমবেত দ্বাদশ সহস্র শ্রোতা সমস্বরে অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। দেশবন্ধু সেই সভায় স্বরাজের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, স্বরাজ মানে কি? আর অসহযোগ মানেই বা কি? স্বরাজ মানে আর কিছু নয়, স্বরাজের এমন অর্থ হয় না যে পার্লামেণ্ট থেকে একখানা এক্টা (আইন) তৈয়ারী ক'রে আমাদের উপহার দেবে। স্বরাজ সে জিনিষ নয়। কেন নয়? স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে তোমার অন্তরের অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। সবার উন্নতি এক রকমে হয় না, সব জাতির উন্নতি একরকমে হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতির অনুসরণ ক'রে সে জাতির মধ্যে সন্ধান করতে হ'বে, সেই প্রকৃতি—যে প্রকৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি না—যে প্রকৃতি কেহ হারাতে পারে না। আমাদের অনেকদিনের পরাধীনতার চাপে—বিলাস মোহে আমাদের যা স্বরূপ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে আছে, তার সাধনা—তার সন্ধানই স্বরাজ। সে জিনিষটা কেউ দিতে পারে না। ইংরেজ একটা শাসনপ্রণালী দিতে পারে—ইংরেজ বলিতে পারে গোলমালে কাজ কি? তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন চাও। সেটা ত স্বরাজ নয়। সেটা তোমার উপার্জ্জন নয়, সাধনার ফল নয়। কেউ কি স্বরাজ দিতে পারে? তোমাকে অর্জ্জন করতে হ'বে, তোমাকে নিজের সাধনায় যা বাস্তবিক সত্য প্রকৃতির সন্ধান ক'রে তাকে

বাহিরে উপস্থিত ক'রে জগতের সমক্ষে দাঁড় করাতে হবে, এই স্বরাজের অর্থ। আমি সেদিন কাগজে লিখেছিলাম যে এই স্বরাজ সাধনা আমাদের অধিকার। তিলক মহারাজ বলেছেন স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদেব অধিকার কেন? আমাদের অধিকার—কারণ আমাদের যেটা প্রকৃতি তা অধিকার করা। যেমন আমার কোন ঐশ্বর্য্য থাকে, আমি বলিব এ ঐশ্বর্য্যে আমার অধিকার। স্বরাজ আমাদেব অন্তরে, স্বরাজ আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সত্য প্রকৃতি, সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার। বিধাতা সে অধিকার আমাদের দিয়াছেন। আমাদের যা প্রকৃত তা বিধাতার দান—বিধাতার লীলা। সমস্ত জগতের ইতিহাস বিধাতার যে অন্তরঙ্গ লীলা, তারই বহিঃপ্রকাশ। সমস্ত ইতিহাস তাই, ভারতের ইতিহাস তাই। লীলাময়ের গুণ কি, লীলাময়ের স্বরূপ কি? তিনি চান বৈশিষ্ট্য। আমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে—তিনি নিজেকে বহু ক'রে নিজে সে বহুত্ব উপভোগ করেন। মহাপ্রভু এই বলে গিয়েছেন নিজেকে বহু করে সেই বহুকে নিজে আস্বাদন করেন—সে আস্বাদন করায় যে ফল সে ফল অন্তরঙ্গ লীলা নয়, সে ফল জগতের ইতিহাস। তিনি যুগে যুগে নিজেকে বহু করেন। সুতরাং এই যে মনুষ্য জাতি একে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ক'বে এর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন স্বয়ং ভগবান। এই বিশিষ্ট প্রকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং ভগবান, রক্ষা করেন তিনি।

সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এর কর্ত্তব্য কি—একথা হিন্দু-মুসলমানকে বুঝাতে হবে না। ইংরাজের রাজনীতি মানি না,

তার ভিতর খুব কোন সত্য কথা থাকতে পারে না আমার এই ধারণা। আমি অনেক পড়েছি, এখনও মনে হয় তার অধিকাংশ কথা ভুল। এই স্বরাজে আমাদের অধিকার কেন বলছি—মানুষের ধর্ম্ম বলতে কি বুঝি। যুগ-শঙ্খ বেজে উঠেছে আর যুগধর্ম্ম এসে তা পালন করতে হয়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই ভারতে নূতন জাতি গড়ে উঠছে। ভগবানের লীলায় আমাদের অধিকার তাঁহার লীলায় যোগ দেওয়া। কারণ প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য—প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য—ভগবানের লীলায় সহায় হওয়া, আমাদের সহায় হতে হবে, অন্য উপায় নাই। আজ কি কাল—কি দু'দিন পরে সহজ পথে কি কুটীল পথে এই লীলার মধ্যে তিনি ডাকেন—যেমন করে তিনি জানেন, কোন্ পথে তিনিই জানেন। এই যুগধ্বনি পথের সহচর স্বরাজ সাধনা আমাদের কর্ত্তব্য। তার কারণ ভগবানের লীলায় তাহার সহচর আমাদের হতেই হবে। বাস্তবিক জ্ঞানে কি অজ্ঞানে জানি না, কেহ এ কথা জানেন—কেহ জানেন না। যিনি ভাল করে জানেন, তিনি অনেক উপরে উঠে গেছেন, কিন্তু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, আমরা ভগবানের লীলার সহচর, সেইজন্য স্বরাজ আমাদের কর্ত্তব্য। স্বরাজ তোমাকে চাইতে হবেই, তোমার প্রকৃতির সন্ধান তুমি করবে না—তোমার প্রকৃতির সন্ধান করবে কি ইংরেজ? কি লজ্জার কথা? এমন শিক্ষা হয়েছে আমাদের--দেশের যে সাধনা, বাঙ্গালাদেশের যা চরম সাধনা—মহাপ্রভু যে ধর্ম্ম রক্ষা করে গিয়েছেন—আজ সে কথা শিক্ষিত লোকের কাছে বলতে হয়, তাঁরা বুঝতে পারেন না এমন আমাদের পতন হয়েছে। তুমি কেন স্বরাজ চাও, আমি কেন স্বরাজ চাই—সে কথা কেমন করে বোঝাব?

যে ক্ষুধিত সে কি বোঝাতে পারে কেন সে অন্ন চায়? সে কি যুক্তির দ্বারা বোঝাতে পারে—সে কি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারে—কেন স্বরাজ চায়? আমার বুকে জ্বালা ধরে না বলে আমি স্বরাজ চাই। এই যে দাসত্বের জ্বালায় জ্বলে মরছি তাই স্বরাজ চাই, আমি এই দাসত্ব দূর করতে চাই। নিজের প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে যা মিথ্যা—যা মিথ্যাকে আশ্রয় করে আছে সে সব মিথ্যাগুলি একেবারে তাড়াতে না পারলে নিজের প্রকৃতিব সাধনা হয় না; তার জন্য স্বরাজ চাই। আজ আমাদের কি আশ্রয় আছে? আমাদের জীবনের প্রত্যেক কক্ষ—আমাদের ধর্ম্মের আচরণ—আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদেব বাদ-বিসম্বাদের ভার—তা মিটানোর ভার, আমাদের ধর্ম্মকথা—আমাদের কর্ত্তব্য আজ যাহা কিছু সব পরের হাতে তুলে দিয়ে বসে আছি। যে পর—যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির কোন সাম্য নাই, সে পরকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে আকড়ে ধরে আছি, মনে করছি বড়ই আশ্রয় পেয়েছি। ওরে মূর্খ সে আশ্রয় কি? সে যে মিথ্যা আশ্রয়, সে যে প্রলোভন, সে যে মোহ, সে যে দুঃস্বপ্ন! সেই হল সত্য আশ্রয়—যা নিজের প্রকৃতি নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভব করে, যা তোমার অন্তরে ফোটে। যেটা তোমার কর্ত্তব্য তাকে বাইরে প্রকাশ কর—তাকে তুমি ভোল কেন? একেবারে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়েছ কিসের উপর—যা তোমার মিথ্যা আশ্রয়। এ কথা বাঙ্গালীকে আজ শিখাতে হবে, শিক্ষিত সমাজকে আজ বোঝাতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল শিক্ষা দীক্ষা পর্য্যন্ত পরের হাতে দিয়ে বসে আছি, তাহা পরের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদায় করে নিতে হবে সেই হল আমাদের

স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। যে শিক্ষা দীক্ষা এতকাল একটা মায়ার বশে বিদেশীর হাতে দিয়েছি, যেটা ধর্ম্মের উপায় তাকে অর্থের উপায় করেছি, নিজেকে ছলনা করেছি, নিজেকে প্রতারিত করেছি, সে মোহ থেকে নিজেকে উদ্ধার কর। সাধনায় নিয়ে এস—টেনে নিয়ে এস।

চব্বিশ পরগণা জেলা সম্মিলনী

চব্বিশ পরগণা জেলা সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত-মণ্ডলীব অভিনন্দনের উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলেন :—

"আপনারা আমার স্বার্থত্যাগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যেটুকু স্বার্থত্যাগ কবিয়াছি, তাহার তুলনায় দেশবাসীর নিকটে যে ভালবাসা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি, তাহা কি অধিকতব স্পৃহনীয় নহে? তবে আমার স্বার্থত্যাগ হইল কোথায়? কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি পৃথক্ পৃথক্ জিনিষ—একের সহিত অন্যের কোনই সম্পর্ক নাই, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহারা বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত—একটাকে অন্যটা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ইহাদিগকে ভিন্ন রকম বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। আসলে কিন্তু ইহারা এক। একটা অন্যটার উপর নির্ভর করে। ক্রীতদাসের কি সমাজ কিংবা ধর্ম্ম আছে? নিশ্চয়ই না। যাহারা স্বাধীন, তাহাদিগেরই মাত্র ধর্ম্ম বা সমাজ আছে। আপনারা যদি আপনাদের ধর্ম্ম কিংবা

সমাজকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে আপনাদিগকে স্বাধীন হইতে হইবে। কাজেই আপনি যদি ধার্ম্মিক হইতে কিংবা সমাজের উপকার করিতেই ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি রাজনীতি বাদ দিতে পারেন না। তাই বলিতেছি, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোন্‌টা যে আগে ও কোন্‌টা যে পশ্চাতে তাহা বলা দুরূহ। দিন রাত্রির পূর্ব্বাপর ঠিক করা যে প্রকার দুষ্কর, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব কি প্রকারে? উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, দেশবাসীর সম্মুখে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাদন করিতে হইবে। আপনারা ক্রীতদাস না হইয়া মানুষ হউন। দেশের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্পাদন করুন। স্মরণ রাখিবেন, স্বাধীনতা অর্জ্জন ও দেশের উন্নতির যাহারা পরিপন্থী হইবে সর্ব্বত্র তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কাউন্সিলের মধ্যেই হউক কিংবা বাহিরেই হউক সে যুদ্ধ আমাদিগকে করিতেই হইবে। কাউন্সিলের কাজের পরিপূরক হইবে বাহিরের গঠনমূলক কাজ। আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি হইয়াছে একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা। গ্রামে আমরা কি প্রকারে কাজ আরম্ভ করিতে পারি, সেই প্রকার কার্য্য পদ্ধতির একটা খসড়া আমি ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে বাহির করিয়াছি। প্রথমে আপনারা কোন জেলার একশতখানা গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ৬।৭টি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করুন, তারপর গ্রামবাসীর দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিতে আরম্ভ করুন। অল্পমূল্যে তাহাদিগকে তৈল লবণ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করুন।

ঢাকা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনী

ঢাকা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন :—"আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান—গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ ! প্রেতের মত আমরা কয়টি আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যা দীপ জ্বালিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না ! কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্ম্মদা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আরবার গরজি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়ে বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসন-দণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এ সেই-ভূমি ! যে ভূমিতে আদিশূর একদিন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ সেই ভূমি! এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের আশীষ মন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এই সেই দেশ ? সিংহল, বালি, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্যলক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্ন বিছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেছে। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন-মরণের মন্দির মধ্যে

না-বাঁচা না-মরা হইয়া আছি, কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব। কবির সে কণ্ঠ আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম—এই অরণ্যানী মুখরিত বনভূমি, শ্যাম-তমাল-দ্রুম সুশোভিত দেশের রূপের কথা; শুনাইতাম—এই অতল জলরাশির অতলতলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত, শুনাইতাম—যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দদাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদিশূরের যজ্ঞভূমি"—বল্লালের অস্থি ভস্মে পরিণত যে দেশের "পথের ধূলি"—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদেব শুনাইতাম; আর শুনাইতাম—অরণ্যের তমসাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহা সমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি!—কি বিজয় কাহিনী! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস! কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার! আর শুনাইতাম—সেই দান সাগরেব কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী বিজয়ীর পলায়ন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতাম। গাহিতাম হরিশ্চন্দ্রের কথা, অদুনা পদুনার সেই প্রাণ মন বিমোহন-কারী মধুর কাহিনী, সেই চাঁদরায়—কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা! হে বাঙ্গালার সন্তান! এ সেই সোণার দেশ, এই দেশে আজ আপনারা আসিয়াছেন। আজ সে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতি আছে; সেই স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্য কথা; তাঁহাদের সেই পুণ্য কাহিনী আজ যদি আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি এই অসীমজলরাশির বুকে তেমনি করিয়া, আবার জাল তুলিয়া জীবন যাত্রার যাত্রা গান গাহিতে পারি।

হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে! সে ত মূক নয়, যজ্ঞের

মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝনন্ রন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—আছে অতিথি, আছে ? যে দেবধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যাণী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় একদিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে বাতাসে এখনও তাহার স্বর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হবিভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাট দেশ শোভিত করুক। এই ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক! আবার তার স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক, দেখিবেন— এই এতকালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া সেই জ্বলিত জ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটীকে জলজ্জাল ললাট দীপিয়া তুলিয়াছে! যিনি সহস্র সহস্র বৎসরের বাঙ্গালার মৃত সতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব নর্ত্তনে সব রিষ ঈর্ষা অক্ষমতা পরানুকরণের গতিচ্ছন্ন অহঙ্কার জ্বালাইয়া, সেই সৃষ্টি পারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন। সংহারের পর আবার নীহারি চায়—নূতন বাঙ্গালার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের রথিগণ! জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন। স্বাহা স্বধা ত্রিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে বল্লালের ভিটায় সেই সব সাধনায় অগ্রসর হউন। তাই বাঙ্গালীরা আপনাদের ডাকিয়াছে। এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া কি ভুলে ভুলিয়া আছি—সেই ভুল একবার ভাঙ্গিয়া দিউন।

আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলা-চঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। 'মাৎস্য ন্যায়ের' অরাজকতার যুগে বাঙ্গালা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গালা ভুলে যায় নাই। আজ বর্ত্তমান যুগেও বাঙ্গালা সেই ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দীর পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গালার স্বভাব ধর্ম্ম, যে প্রাণ মূর্ত্ত্য করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরপ্রান্তে সেই অদ্বৈত বংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহন বনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্ত্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন। সুখ দুঃখের অনেক কথা আপনাদের শুনাইতে চাই, সব শুনাইতে পারি কই, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—বুক ফাটিয়া যায়! বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গালার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এতকালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এত অন্ধকার, দীর্ঘনিশ্বাস ও হা হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই। এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্যহীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া একহাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সুদিন গেছে কুদিন আসিয়াছে! আপনারা দুর্দ্দিনের অতিথি, দুঃখী বিদুরের ক্ষুদ আছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই আপনাদের নিবেদন করে—শ্রদ্ধার হবিঃ গ্রহণ করুন, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হউক—কৃতকৃত্য হউক।

"দরিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।"

হে সাত্মিক! আসুন তবে সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি আসুন। মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্র-দল বাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্ত-চরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নী কৃত্তবাসে বলিব—জননি জাগৃহি!

ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু

অনেকে বলেন, চিত্তরঞ্জন বিলাসী ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। নাগপুর কংগ্রেসে একজন বাঙ্গালী ডেলিগেট মারা গেলে চিত্তরঞ্জন নগ্নপদে ৬।৭ মাইল পদব্রজে হাটিয়া সেই শব দেহের অনুগমন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতেছিল। নাগপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর দেশে প্রবল ঝড় উঠে। সেই ঝড়ে দেশবন্ধু অচল অটল থাকেন। একদিনও তিনি বিচলিত হন না। ১৯২১ সালের নভেম্বরের শেষে

বাঙ্গালায় যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে দেশবন্ধুর স্বার্থত্যাগ আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কে আগে স্বেচ্ছাসেবক ভাবে সরকারের হুকুম অমান্য করিবে, এই কথা উঠিলে দেশবন্ধু স্পষ্টতঃ বলেন, নিজের পুত্রকে আগে জেলে না পাঠাইয়া অপরের পুত্রকে জেলে যাইতে বলার অধিকার আমার নাই। তিনি লোকমতের মর্য্যাদা কত অধিক রক্ষা করিতেন, ইহাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

দেশবন্ধুর যখন সাংসারিক উন্নতির সময় তখন অনেকেই তাঁহার দান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু দৈন্য প্রপীড়িত দেশবন্ধুর দানের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? যখন জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা ছিল না, তখন কোন কর্ম্মী অভাবের কথা জানাইবামাত্র তাহাকে তখনই নিজের সাংসারিক খরচের যে সামান্য টাকা থাকিত তাহা হইতে সাহায্য করিতেন। কোনদিন তিনি কোন কর্ম্মীকে নিরাশ হৃদয়ে ফিরাইয়া দেন নাই। নিজে পরদিন কি খাইবেন সে চিন্তা নাই, কর্ম্মী সাহায্য-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, ঘরে যাহা কিছু থাকিত দেশবন্ধু তাহা দ্বারা কর্ম্মীকে সাহায্য করিতেন।

চিত্তরঞ্জন নিজেকে কখনও মহত্তর বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, দেখ মহাত্মার মনে কোন হিংসা নাই বলিয়া মহাত্মার কোন শত্রু নাই, আর আমার মনে হিংসা আছে বলিয়া আমার শত্রুও চারিদিকে। চিত্তরঞ্জন মাত্র পাঁচ বৎসরকাল দেশের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পাঁচবৎসরে তিনি যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা কেহ "অর্দ্ধশতাব্দী কালেও" পারেন নাই। চিত্তরঞ্জন পরাধীনতার নির্ম্মম

দুঃখ যেরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কোন দেশ-কর্ম্মী সেরূপ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী যেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দেশের কাজ করিতে গেলে চাই ত্যাগ—চাই নিষ্ঠা। সেদিন মহাত্মার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন—দেশবন্ধু। তিনি স্বাধীনতাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া কখনও সম্ভোগ করিবার কখনও পক্ষপাতী ছিলেন না, "ভূমৈব তৎসুখম্ নাল্পেসুখ মস্তি" এই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। তাই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য শব-সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাই তিনি পাঁচ বৎসর কালমাত্র ভারতের রাজনীতিক তরণীর কর্ণধার-পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও এই পাঁচ বৎসরে "স্বাধীনতা" ছাড়া অন্য কিছুরই চিন্তা করেন নাই। তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত যখন, তখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন। সেদিন তিনি ষ্ট্রেচারে করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় গিয়াছিলেন। স্বাধীনতার জন্য মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি এতটাই বেদনা অনুভব করিতেন। চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি ছিল কপটতাবিহীন—তিনি কপটতার দ্বারা কখনও রাজনীতিক সংগ্রাম চালাইতে চাহেন নাই। ত্যাগ ও প্রেম এই দুইটি ছিল তাঁর জীবনের রাজনীতির প্রধান অবলম্বন—ত্যাগ ও প্রেম ছিল তাঁহার মাতৃপূজার প্রধান উপকরণ। মাতৃপূজার মন্দিরে তাঁহার নিকট জাতিভেদ ছিল না, হিন্দু মুসলমান-পার্শী-খ্রীষ্টান সকলকেই তিনি মাতৃপূজায় আহ্বান করিয়াছিলেন। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালীর পাঁচ জন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ৺রামমোহন রায়, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জন

একাধারে ভাবুক ও কর্ম্মী ছিলেন। কবি ও ভাবুকের দৃষ্টিতে তিনি ভাবিতেন। আবার কর্ম্মীর দৃষ্টিতে সেই ভাবকে বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিতেন।

কবি চিত্তরঞ্জন

এতক্ষণ আমরা রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনের যৎসামান্য পরিচয় দিয়াছি, এইবার কবি চিত্তরঞ্জনের পরিচয় দিব। রাজনীতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে—অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন কবি ছিলেন, ভাবুক ছিলেন, ইহা কে না জানেন? এইবার কবি চিত্তরঞ্জনকে পাঠকসমাজে আরও একটু প্রস্ফুটিতরূপে উপস্থিত করিব। চিত্তরঞ্জন যে ভবিষ্যজীবনে একজন বড় কবি হইবেন তাহার পরিচয় তাঁহার বাল্যকালেই—পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার সহপাঠী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে চিত্তরঞ্জনের সহপাঠী, তখন এক একদিন চিত্তরঞ্জন বাটী হইতে এক একটি কবিতা লিখিয়া আনিতেন। বাল্যকালের সেই রচনাশক্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া শেষে তাহাই তাঁহার কবিত্বশক্তির

উন্মেষণা জন্মাইয়াছিল। তিনি যদি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান না করিয়া কবিতা-সুন্দরীর আরাধনা করিতেন তাহা হইলেও কবি হিসাবে তিনি অক্ষয় ও অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে দেশকে কত ভালবাসিতেন, সকল ধর্ম্মের উপর দেশ-সেবা ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি যে কি পরিমাণে সেই ধর্ম্ম সাধনা করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই কবি তাঁহার "বাঙ্গালার গীতি কবিতার" প্রারম্ভে বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালার জল; বাঙ্গালার মাটীর মধ্যে একটি চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে ও নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে, শত সহস্র আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গালার ঢেউখেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুর গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্র কানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর-প্রাঙ্গণ, বাঙ্গালার নদনদী খাল বিল, বাঙ্গালার মাঠ, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গালার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার তুলসীপত্র, বাঙ্গালার গঙ্গাজল, বাঙ্গালার নবদ্বীপ, বাঙ্গালার সেই সাগর তরঙ্গে বিধৌত চরণ জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গালার

সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী সঙ্গম, বাঙ্গালার কাশী, বাঙ্গালার মথুরা-বৃন্দাবন। বাঙ্গালীর জীবন, আচাব ব্যবহার, বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে সেই প্রাণ ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে—তুলিতেছে।"

কি মধুর, কি মোহন! কবি চিত্তরঞ্জন বঙ্গজননীর পল্লীশ্রীর মোহন মুরতি দেখিয়া মজিয়াছেন—ডুবিয়াছেন—আত্মহারা হইয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন যেমন সুদূর ইংলণ্ডে রূপৈশ্বর্য্যের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও কপোতাক্ষের স্ফটিক স্বচ্ছ নির্ম্মল জলকণার স্মৃতি ভুলিতে পারিতেন না, সেইরূপ চিত্তরঞ্জনও সর্ব্বদা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও পল্লীর সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সতত পল্লীর মন্দির, পল্লীর বেদী, পল্লীর ঘাট বাট চিত্তরঞ্জনের মন-প্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কবি চিত্তরঞ্জন যে পরবর্ত্তীকালে দেশকে এত ভালবাসিয়া দেশের জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে পল্লীর প্রতি তাঁহার এই ঐকান্তিক অনুরাগ নিহিত। চিত্তরঞ্জন দেশ-মাতৃকাকে ঠিক জগজ্জননীর মত দেখিতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিরূপে তিনি সেই জগজ্জননী মায়েরই মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"—অনন্তরূপ লীলাধরের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট-রূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া চিত্তরঞ্জন এই যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা—সেই ভাষা হইতেই বুঝা যায় যে চিত্তরঞ্জন দেশকে কিরূপ মায়ের ন্যায় ভাল বাসিতেন! তিনি উত্তরে ঐ শৈল কিরিটিনী হিমাচলকে ভারতজননীর কুন্তলরাশি, নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরী জাহ্নবী ব্রহ্মপুত্রের রজতধারাকে মায়ের পীযূষ পূরিত স্তন্যধারা মনে করিতেন। দেশকে এইভাবে মূর্ত্ত প্রতিমা বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই চিত্তরঞ্জন দেশমাতৃকার সেবায় নিজের জীবনকে অর্ঘ্যস্বরূপে দান করিতে পারিয়াছিলেন।

কবি চিত্তরঞ্জন যে দারিদ্র্যের ব্যথা দেখিয়া মরমে কাঁদিয়া মরিতেন—দরিদ্রের অশ্রু তাঁহার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গভীর বেদনার সুর বাজাইত, ইহা তাঁহার কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। আবার তিনি যে ভগবৎপ্রেম—দেশসেবার প্রেম অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী উপভোগ করিতে চাহিতেন না। কবি চিত্তরঞ্জন একাকী ভোগ করিবার লোক ছিলেন না। তাই জাগরণ কবিতায় কবি চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"আমার এ প্রেম তুমি রেখো না বাঁধিয়া
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বদ্ধ কুসুমের
সমস্ত গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পাক্ প্রেম মরমের।"

আমার এ প্রেম আমি একাকী ভোগ করিতে চাহি না। কোথায় আছ বিশ্ববাসী, আমার ভ্রাতা ভগ্নী তোমরা সকলে এস—ছুটে এস, তোমরা আমার এই মর্ম্মের প্রেম বাঁটিয়া লও। আমি নিজে এ প্রেমের

আস্বাদন করিয়াছি, করিয়া দেখিয়াছি অমৃতের ন্যায় এ প্রেম বড় মিষ্ট, বড় মধুর! তোমরা এ প্রেমের আস্বাদন না করিলে আমার যে আশা তৃপ্ত হয় না! তাই ডাকিতেছি বিশ্ববাসী এস, এস, আসিয়া আমার এই প্রেমের আস্বাদন কর। তোমরা আস্বাদন না করিলে আমার যে তৃপ্তি হইবে না—আমি যে শান্তি পাইব না—আমি যে তোমাদের সকলের সহিত মিলিয়া এই প্রেমের আস্বাদন করিতে চাই। এই যে নিজের আস্বাদিত প্রেমকে সমস্ত জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া তাহা সকলের সহিত একত্রে অনুভব করা, তাহাই চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তার মূল মন্ত্র।

কবির মালঞ্চ প্রকাশিত হইবার পর "সাগর-সঙ্গীত" প্রকাশিত হয়। তাহাতে কবি চিত্তরঞ্জনের নিজের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

"সাগর-সঙ্গীত" কবির স্বভাবের শোভায় মুগ্ধ হৃদয়ের ছবিখানি মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে গেলে নিতান্ত মূকের মুখেও ভাষা ফুটিয়া উঠে, যেখানে গেলে নাস্তিকের প্রাণেও আস্তিক্য বুদ্ধি জাগরিত হইয়া উঠে, কবি সেইখানে বসিয়া "সাগর-সঙ্গীত" রচনা করিয়াছেন। ভারতের উপকূল ত্যাগ করিয়া ভীম ভৈরবনাদী উর্ম্মিমালা সঙ্কুল মহা জলনিধি বক্ষে যখন চিত্তরঞ্জন ইংলণ্ড যাইতেছিলেন, তখন সেই নীলাম্বুধির কখন রুদ্র, কখন শান্ত, কখন মধুর, কখনও ভীম ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া কবির চিত্তে যে ভাবের উন্মেষ হইয়াছে, কবি তাহাই ভাষার তুলিকায় বিচিত্র করিয়া "সাগর-সঙ্গীত" রচনা করিয়াছেন। সাগর-সঙ্গীত স্বাভাবিকতার আধার—নৈসর্গিক শোভাসম্পদের আকর। সাগরের বক্ষে পড়িয়াই কবি প্রথমে দেখেন, চারিদিকে অসীম,

অনন্ত আকাশ সীমা নাই, কূল নাই, কিনারা নাই, কবি টলমল করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় ওপারের ভূমি দে'খতে চেষ্টা করিতেছেন। কবি বুঝিতে পারিতেছেন না তিনি কোন্ রাজ্যে। চারিদিকে চন্দ্রকরোজ্জ্বল মহার্ণব, জলরাশি সেই চন্দ্রকিরণে টলমল করিতেছে, ভাবমুগ্ধ কবি সেই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন।

তারপর রাত্রি প্রভাত হইল, তারপর প্রভাত! প্রভাতে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে বসিয়া কবি চিত্তরঞ্জনের বোধ হইতেছে যেন, ধীরে ধীরে একটা জ্যোতিষ্মান্ গোলক সমুদ্র গর্ভ হইতে উদিত হইতেছে, কবি চিত্তরঞ্জন তাহা দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-বিমুগ্ধ! কবি তাই গাহিতেছেন—

"তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে
আমার সকল অঙ্গ শিহরে শিহরে!
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে,
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।"

প্রভাতের নৈসর্গিক শোভা সেই স্থির সমুদ্রে কবি চিত্তরঞ্জনের মনঃপ্রাণকে একেবারে ভরপুর করিয়া ফেলিয়াছে! কবি দেখিতেছেন চারিদিকে যেন থরে থরে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া সুন্দর, সুঠাম বিহঙ্গমকুল উড়িয়া বেড়াইতেছে! কবির হৃদয় আনন্দের হিল্লোলে একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। কোথায় যে তিনি এই সুখের ভার রাখিবেন তাহা আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, দু'কূল প্লাবিত করিয়া বর্ষার বারিধারা যেমন উচ্ছ্বসিত বেগে প্রধাবিত হয়, কবি চিত্তরঞ্জনও তেমনি সমুদ্র মধ্যে শান্ত স্নিগ্ধময়

প্রভাতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এত সুখী হইয়াছেন যে, সে সুখ তিনি যে কোথায় রাখিবেন তাহা আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই কবি গাহিতেছেন—

"কোথায় রাখিব আর এ সুখের ভার
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার।
এই অজানিত সুখ এ দুঃখ অজানা—
বাধাহীন এ উৎসবে মানে না যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে
সব দুঃখ আজ মোর গীত হয়ে উঠে।"

কবির আজ আর গীত থামিতেছে না। কবি অনন্ত আকাশ, অনন্ত সমুদ্র দেখিয়া প্রাণে এক অনন্তের সাড়া পাইয়াছেন, তাই গাহিতেছেন—

'আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরাণ।
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতে আলো মাঝে, সাঁঝের আঁধারে।"

ইহার পরক্ষণেই অনন্ত পারাবারকে লক্ষ্য করিয়া কবি চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন,

"অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দু'জনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ স্রোতে!
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে।"

তোমায় আমায় একই প্রাণ ধারা হ'তে এসেছি। একই অনন্ত উৎস হইতে তুমি ও আমি গিরি নির্ঝরিণীর মত উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছি। আমাদের এ মিলন ত আজিকার এ নূতন মিলন নহে, আমরা উভয়ে যে কতবার এই ভাবে দুইজনে মিলিয়া কত আলাপ পরিচয় করিয়াছি। হে পারাবার! তোমাতে আমাতে পরিচয় আজ ত এই নূতন নয়। তুমি যে আমার বহু-কালের অন্তরঙ্গ—বহুদিনের বন্ধু—সখা! এমনই ভাবে কতবার আসিয়া কতবার দু'জনে অনন্তের সন্ধানে ছুটেছি, কে বলে তুমি আমার কাছে নূতন! তুমি আবার কাছে নিত্য, সত্য, শাশ্বত, অতি পরিচিত!

এতদিন আমি তোমায় ভুলিয়াছিলাম, বন্ধু সিন্ধু হে, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর। আজ হঠাৎ তোমার গান শ্রবণ-বিবর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করায় আমি বুঝিয়াছি, বন্ধু! তুমি ত আমার অপরিচিত নও, ও স্বর যে আমার বড় পরিচিত, ওই স্বরের সহিত সুর মিলাইয়া আমি যে কতবার কত গান করিয়াছি! আমি ঘরের মধ্যে ছোট ছোট দীপ লইয়া খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ তোমার গর্জ্জনে আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইয়াছে। আমি—

> "ছোট ছোট দীপ ল'য়ে খেলিতেছিলাম—
> গুণ গুণ গাহি গান ঘরের ভিতরে—
> যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে
> অনন্ত রাগিণী ভরা—ধ্বনিতে তোমার,

হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার।
ভাঙ্গিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল!
আমায় তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল।"

আমার ক্ষুদ্র খেলাঘর ভাঙ্গিয়াছে, সঙ্কীর্ণতার অষ্ট প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আমি ভূমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যদি আসিয়া পড়িয়াছি তবে হে আমার অনন্ত বন্ধু তোমার অনন্তের মাঝে আমাকে ডুবাইয়া দাও—আমাকে ভাসাইয়া ওই দূরে ওপারে লইয়া চল, দেখি আমার সেই আশার স্বপ্ন—সেই চিরবাঞ্ছিত ধনকে আমি পাই কি না।

"আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ।
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে!
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন?"

আমার প্রাণে শান্তি নাই। হে বন্ধু সিন্ধু! আমায় ওপারে লইয়া চল, ওপারের সঙ্গীত শুনিয়া আমি যাহাতে প্রাণে শান্তি পাই, বন্ধু হে তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।

"ওপারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মত
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবস নিশায়?
ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল,
পরাণ-পরশে তবে আমারি মতন?

ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর-ছায়া পরাণ স্বপন ?
আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ !
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে !

কবি চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের অসীমত্ব যদি বুঝিতে হয় তবে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কবির "সাগর-সঙ্গীতে"।

এইবার কবির "অন্তর্য্যামী" গ্রন্থের পরিচয় দিব। "অন্তর্য্যামী" চিত্তরঞ্জনের ভগবদ্ভক্তিমূলক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। ভক্তির পরাকাষ্ঠা বা পরিণতি যে আত্ম নিবেদন সেই "আত্ম নিবেদন" আমরা অন্তর্য্যামীতে দেখিতে পাই। ভক্ত ভগবানকে তখনই পায় যখন সে তাহার যাহা কিছু এমন কি আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ভগবানে সমর্পণ করে। ইহাকেই আত্ম নিবেদন বলে। তুমি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র, আমায় যে পথে হয় লইয়া চল; আমি তৃণ—তুমি স্রোত, আমায় যেদিকে ইচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া চল। ভক্তের মনে যখন এই প্রকার ভাব উপস্থিত হয় তখনই তাঁহার প্রাণে আত্ম নিবেদন শক্তি জাগিয়াছে বলিতে হইবে।

যদ্ করোষি যদশ্নাসি যজ্জু হোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

অর্থাৎ যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু খাইবে, যাহা কিছু দান কিংবা তপস্যা করিবে, হে অর্জ্জুন, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

শ্রীমদ্ভগবত গীতায় আত্ম নিবেদনাসক্তির এই লক্ষণই শ্রীশ্রীভগবান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আত্ম নিবেদনাসক্তি লাভ করিতে পারিলে ভক্ত ভগবানের সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালুক্য লাভে সমর্থ হয়।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন যে এই আত্মনিবেদনাসক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, নিজের অস্তিত্ব ধন, মান জীবন, যৌবন সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার অন্তর্য্যামী গ্রন্থ পড়িলেই জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বে ভক্ত সাধক কবি নিজের পরিণাম কি হইবে তাহা একটু একটু ভাবিতেন, এখন সে ভাবনাও তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন—নিজেকে একেবারে ভগবানে সমর্পণ করিয়া গাহিতেছেন,—

"ভাবনা ছাড়িনু তবে এই দাঁড়াইনু আমি !
যে পথেতে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্য্যামী।

*　　*　　*　　*　　*

যে পথেই লয়ে যাও যে পথেই যাই ;
মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই।

*　　*　　*　　*

......আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে !
তোমারে পেয়েছি কিগো ? তা ত মনে নাই !
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই।

ভক্তের হৃদয় তন্ত্রী হইতে ঝঙ্কৃত কি অকৃত্রিম ভক্তির কথা ! কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী গোপিকাগণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য যে কাতরতা দেখাইতেন, চিত্তরঞ্জনের অন্তর্য্যামীতেও সেই আকুলতা। তিনি যে একজন পরম ধর্ম্ম সাধক ছিলেন এবং ভগবানের প্রত্যাদেশ লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তর্য্যামীতেই সুপ্রকাশ। তিনি যে ভবিষ্য জীবনে পার্থিব যাহা কিছু নশ্বর ঐশ্বর্য্য সম্পদ তাহা ত্যাগ করিয়া নিত্য

শাশ্বত পথের সন্ধানে ফিরিবেন ইহা তাঁহার অন্তর্য্যামী পাঠেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছিল। মানুষের যাহা কিছু ক্রিয়া তৎসমস্ত তাঁহার অন্তর্নিহিত চিন্তার বহির্ব্বিকাশ মাত্র। মানুষ মনে যে চিন্তা ও কল্পনা করে তাহাই বাস্তব জগতে কার্য্যে ফুটাইয়া তুলে। কাজেই কোন মানুষ ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে না দাঁড়াইবে তাহা তাঁহার চিন্তার ধারা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। চিন্তা ক্রিয়ার পূর্ব্বগামী। কবি চিত্তরঞ্জন অন্তর্য্যামীতে গাহিয়াছিলেন—

"যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোরে।
পথখানি যেথা থাক পাব আমি পাব ;
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব ;
পথখানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায়!
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়!
কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথখানি,
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা জানি।"

অন্তর্য্যামী ১৬—১৭।

চিত্তরঞ্জন তাই চিরদিন পথের সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেই দেখিতে পাইলেন "ত্যাগই" একমাত্র পথ, এই ত্যাগের পথ ছাড়া ভব-কারাগার হইতে পলাইবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন তিনি এই পথেরই আশ্রয় লইলেন। কল্পনার সহিত বাস্তবের এমন সুখের মিলন চিত্তরঞ্জনের জীবনে যেমন সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। চিত্তরঞ্জনের কবিতা শুধু কবিতা লিখিবার খাতিরে নহে, তাঁহার মনের ভিতর যে ভাবটি নিত্য জাগিয়া উঠিত তাহাই তাঁহার লেখনী দিয়া

স্বতঃই ফুটিয়া বাহির হইত। পরবর্ত্তী জীবনে চিত্তরঞ্জন যে যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ফকীর হইবেন, উপরোক্ত কবিতা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু পথের সন্ধান পাইয়াও কবি দেখিলেন! কি দেখিলেন—

"পথের মাঝে এত কাঁটা? আগে নাহি জানি!
কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি!
কাঁটায় কাঁটায় কালা কালা—
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা—
কাঁটার জ্বালা বুকে ক'রে গেছে পথখানি!
কাঁটার ঘায় জ্ব'লে জ্ব'লে চলছি পথ চাহি!
বেড়া আগুনের মত
জ্বলছে প্রাণে অবিরত—
সে জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে এত পথ বাহি!
তোমার গাওয়া প্রাণের গান, সে গান গাহি।"

কবি পথের সন্ধান পাইলেন, পথ বাহিয়া চলিলেন, কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, পথ কণ্টকে আচ্ছন্ন। চারিদিক হইতে প্রতিবাদ-কণ্টক আসিয়া কবির দেহ মনকে জর্জ্জরিত করিতেছে, কবির সেদিকে দৃকপাত নাই। তিনি যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার অসহযোগের পথ—তাঁহার দ্বৈত্যশাসন ভঙ্গের পূর্ব্বাভাষ। কবি ভগবদ্ভক্তির ভাবাবেশে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই শেষে রাজনীতির পথে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দেশের মুক্তির জন্য—আত্মার মুক্তির জন্য—জাতির মুক্তির জন্য

কবি চিত্তরঞ্জন যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবন প্রাণ উৎসর্গ করিবেন, তাহা অন্তর্য্যামীর পূর্ব্বোক্ত দুইটি কবিতাতেই সুপ্রকাশ।

চিত্তরঞ্জন দেশের সেবাকে ভগবানের সেবার মন্ত্র বলিয়া জানিতেন। এই যে চক্ষুর গোচর অগোচর স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ ও জীবপুঞ্জ ইহারা সকলেই ভগবানের অংশ, একই অনন্তের অণুপরমাণু ইহাদের সেবা করিতে পারিলেই যে ভগবানের সেবা করা হয়, চিত্তরঞ্জন এই মহাসত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ভগবানাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির কর্ম্ম ও ভক্তিবাদের সহিত চিত্তরঞ্জনের কর্ম্ম ও ভক্তিবাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। "জীব সেবা করে যেই জন" সেইজন প্রকৃত পক্ষে ভগবানের পূজা করে, ইহা যেমন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী তেমনি চিত্তরঞ্জনেরও বাণী ছিল জীব সেবা। হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কৌলিক প্রথানুযায়ী দোল, দুর্গোৎসব পূজা পার্ব্বণ করিয়া চিত্তরঞ্জন কোনদিন "ধর্ম্ম কর্ম্ম" করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিংবা ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইলেও তিনি কখনও সমাজে গিয়া চক্ষু মুদিয়া ও মুছিয়া ভগবৎ সেবার কর্ত্তব্য ক্ষালন করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম ছিল—আতুরের সেবা। তাঁহার ভগবান ছিল—জননী জন্মভূমি। তাই তিনি ১৯১৭ সালের ১০ই অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছিলেন—"দেশকে সেবা করিলে, জাতিকে সেবা করিলে, মানব সমাজকে সেবা করা হয়। আবার মানব সমাজের সেবাতে মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।"

ইহাতে কি বুঝা যায় না চিত্তরঞ্জন ভগবানের একটা প্রত্যাদেশ লইয়া ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন? তিনি যে প্রত্যাদেশ

লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের শৈশব হইতে নানা ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিত, যৌবনে তাহাই কবিতাকারে তাঁহার প্রাণ হইতে বাহির হইয়াছিল। আর সেই কবিতাই তাঁহার ভাবী জীবনের বিরাট ত্যাগের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল। তিনি যে কোন বিষয়ে কবিতা লিখুন তাঁহার প্রত্যেক কবিতাতেই যেন তাঁহার পথের সন্ধানের জন্য আকুলি ব্যাকুলি থাকিত। চিত্তরঞ্জন প্রেমিক ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন বলিয়াই—তিনি জগৎটাকে প্রেমময় বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম ছিল অফুরন্ত ; প্রাণটা ছিল আকাশের ন্যায় দিগন্ত প্রসারিত। দুঃখীর দুঃখ দর্শনে শুধু যে তাঁহার হাতখানি তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত তাহা নহে, পরন্তু দুঃখীর বেদনা তাঁহার প্রাণের মধ্যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার ঝঙ্কার দিয়া মর্ম্মস্পর্শী কবিতার আকারে ফুটিয়া উঠিত। আগে ভাব তারপর বস্তু। আগে ভাবের উদয় না হইলে কাহারও বস্তুর জন্য অনুসন্ধান আসে না। চিত্তরঞ্জন যে খুব বড় বড় আভিধানিক ভাষা দিয়া তাঁহার কবিতা রাশিকে সংগ্রথিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি ছিলেন ভাবুক কবি। ভাবেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন। তাই ভাবের বশে যাহা প্রাণে আসিত তাহাই তিনি লিখিতেন। কাজেই চিত্তরঞ্জনের কবিতা যদি কেহ ভাষার দিক দিয়া বিচার করিতে যান তবে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে। যে ভাষার মেঘমন্দ্রধ্বনি মাইকেলের কাব্যে, নবীনচন্দ্রের পলাসীর যুদ্ধে, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জনে সে ভাষার দুন্দুভিনিনাদ চিত্তরঞ্জনের কবিতায় নাই।

রামপ্রসাদ যে ভাবের প্রেরণায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতেন, সাধক নীলকণ্ঠ যে ভাবের প্রেরণায় পদাবলী রচনা করিতেন, সেই ভগবদ্ভক্তিমূলক ভাবের প্রেরণায় চিত্তরঞ্জন কবিতা লিখিতেন। অতি সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন ভাষায় চিত্তরঞ্জন কত বড় গভীর ভাব প্রকাশ করিতেন তাঁহার একটি উদাহরণ দিতেছি। "আপনার কাছে" শীর্ষক কবিতাটিতে কবি চিত্তরঞ্জন মাত্র দুইটী কথায় কেমন মহান্ ভাব প্রকাশ করিতেছেন—

"ওরে পাখী সন্ধ্যা হ'ল আয়রে কুলায়
সমস্ত গগন ভরি
আঁধার পড়িছে ঝরি
ওরে পাখী অন্ধকারে! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয়রে কুলায়!
মালা।

এখানে কবি দু'টি কথায় মনরূপ পাখীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, মন তুই ফিরে আয়। এতদিন যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া বেড়াইয়াছিস্, কোন দিন বাগ মানিস্ নাই—কোন কথা শুনিস্ নাই। এখন চেয়ে দেখ আমার জীবন দিনের অবসান হইতেছে, সমস্ত জীবনাকাশ ভরিয়া কালের ঘন কৃষ্ণ মসীবর্ণ মেঘ আসিয়া বসিতেছে, আমার জীবনের উপর কালের অন্ধকার আসিয়া পড়িতেছে, এ সময় ফিরিয়া আয়। আর কেন মন? এতদিন নিজেকে চিন নাই, নিজের নীড়ে একটি দিনও স্থিরভাবে বস নাই, এইবার আমার জীবন-সন্ধ্যার সমাগমে ঘরে ফিরে এস। মন তুমি একবার

আপনাকে চিন। আত্মবোধ কর—আত্মদর্শন কর। এতকাল ত বিষয় বিষয় টাকা টাকা করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে, কিন্তু যাহাতে ভূমাসুখ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান পাইয়াছ কি?

"সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্ত চেতসাম্।
কুতস্তদ্ধ ধনঃ লুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চধাবতাম্।
ন ত্যক্তাশ্চ সুখমাপ্নোতি ন তাক্তা বিন্দতে পরম্॥

মনরে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাক, ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বেড়াইও না। সাধক রামপ্রসাদও ঠিক এমনি ভাবে মনকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমি রইল পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।"

বস্তুতঃ রামপ্রসাদের সঙ্গীতে আমরা যে ভগবদ্ভক্তি দেখিতে পাই, চিত্তরঞ্জনের কবিতাতেও সেই ভাব-ধারা সন্নিবেশিত।

চিত্তরঞ্জন কেবল স্বভাব কবি ছিলেন না, তিনি একজন শক্তিশালী গদ্য-লেখকও ছিলেন। তাঁহার গদ্যের ভাষা সরল হইলেও তরল নহে, আড়ম্বর বহুল ও অলঙ্কার বিড়ম্বিত না হইলেও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সহজ হইলেও শক্তিশালী। ইংরাজী ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি যে বাঙ্গালা লিখিতেন তাহা খাঁটি বাঙ্গালা—ইংরাজীর অন্ধ অনুকরণে লিখিত বাঙ্গালা নহে। যাঁহারা নিয়মিত ভাবে তাঁহার "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্র পাইয়াছেন তাঁহারা তাঁহার

সমালোচনা শক্তি ও গদ্য লিখিবার ক্ষমতার বিষয় অবগত আছেন। এই **নারায়ণ** পত্রের জন্য তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। "নারায়ণে" প্রতি মাসে অতি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ-সম্ভার বাহির হইত। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনেক চিন্তাশীল লেখক নারায়ণে লিখিতেন। নারায়ণের বঙ্কিম সংখ্যা অতি উপাদেয় হইত। ইহাতে প্রতি বৎসর বঙ্কিম চন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ পাইত। নারায়ণে চিত্তরঞ্জন "বাঙ্গালার কথা" "ব্যবসা বাণিজ্যের কথা" "শিক্ষা-দীক্ষার কথা" "ডালিম" প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবন্ধ ও গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার গদ্য-সাহিত্য লেখার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছেন।

দেশবন্ধুর উপদেশবাণী

দেশবন্ধু অনেক সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্ম্মীদের নিকট বাঙ্গালার কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিতেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে আমরা তাঁহার উপদেশবাণীগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

(১) বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেইরূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ।

(২) বাঙ্গালীর ভিতর যে ইউরোপের ইহকাল-সর্ব্বস্ব সভ্যতা ও আদর্শের বীজ আছে, আমার এরূপ মনে হয় না। কাজেই বাঙ্গালীতে ও শ্বেতাঙ্গে মিলন কখনই হইতে পারে না।

(৩) যে জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা দিয়াই সে জাতির সমাজকে সংস্কার করিতে হইবে। অন্য জাতির বিপরীত মুখী আদর্শের দ্বারা কোন জাতির সমাজ সংস্কার হইতে পারে না। আপন জাতির মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে সেই শক্তির দ্বারা সমাজের সংস্কার করিতে হইবে।

(৪) বাঙ্গালা মরিয়াছে কেন? বাঙ্গালীর বাণিজ্য নাই বলিয়া। বিলাসিতায় বাঙ্গালী মারা যাইতেছে, অথচ ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত অন্য প্রদেশের লোক গ্রহণ করিয়া দিন দিন তাহারা কেমন সমৃদ্ধ হইতেছে।

(৫) ভোগের দ্বারা কখনও জীবনকে গঠন করা যায় না, জীবনকে গঠন করিতে হইলে ত্যাগের দ্বারা গঠন করিতে হয়। ভোগকে পুরীষ নিষ্ঠীবনের মত অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৬) পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা লোপ পাইয়াছে। পিতৃব্যের সহিত এখন অনেক

লোকের বৎসরান্তে সাক্ষাতই হয় ত হয় না। ভাইয়ে ভাইয়ে সামান্ত এক টুক্‌রা জমি লইয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিতেছে। বাঙ্গালী সংসারের সে নিরাবিল আনন্দ ও শান্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে।

(৭) বাঙ্গালার সম্পদ বাঁড়াইতে গেলে বিদেশীর অনুকরণে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহা হইবে না। আমাদের কুটীর শিল্পকে পুনরায় জীবিত করিতে হইবে। কলকারখানা একটা রাক্ষসের মত, ইহা মানুষের মনুষ্যত্বকে একেবারে ধ্বংস করে।

(৮) এই যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছেলে বি এ, এম্ এ, পি এইচ্ ডি, পি আর এস্ প্রভৃতির চাপরাশ বুকে আঁটিয়া বাহির হইতেছে, ইহারা কি মানুষ? ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে শুধু অহঙ্কারী হইয়াই উঠিতেছে, ইহাদের আত্মজ্ঞানের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই।

(৯) ভারতের স্বাধীনতা কিরূপে আসিবে? সহরে বসিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলে স্বাধীনতা আসিবে না। জাতির যাহারা মেরুদণ্ড সেই পল্লীগ্রামে যাইয়া পল্লীবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আকুল না হইলে কখনও স্বাধীনতা লাভ হইবে না। এজন্য পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ পাঠাগার, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীর জনমতকে স্বাধীনতার অনুকূল করিয়া গঠন করিতে হইবে।

(১০) বাঙ্গালী কি রাজদ্রোহী জাতি? কখনই নহে। সরকার পুনঃ পুনঃ দমননীতির প্রয়োগ করিয়া এ জাতিকে বিদ্রোহী

করিয়া তুলিতেছেন। দমননীতির দ্বারা কখনও কোন জাতির প্রবুদ্ধমান স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কোন গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই।

(১১) আমরা যে অন্নাভাবে মরিতেছি, আমি এজন্য ততটা ভাবিনা, কিন্তু আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহারে দিন দিন যে বিদেশী সভ্যতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আমি এইটাই সকলের চেয়ে আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করি।

(১২) খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, আমি সেটাকে বড় সাংঘাতিক মনে করি না, পলাশীর আম্র কাননে মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ দুই চারিটী আতসবাজী ফুটাইয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিলেন, আমি তাহাও বিশেষ গুরুতর মনে করি না, কিন্তু ভারতে যে Cultural Conquest হইতেছে আমি তাহারই পরিণাম ভাবিয়া আকুল হইতেছি। এই Cultural Conquest এর হাত হইতে অব্যাহতি না পাইলে বাঙ্গালী—তথা ভারতবাসীর মুক্তির কোন আশা নাই।

দেশবন্ধুর উপদেশ

সাহিত্যের প্রসঙ্গে দেশবন্ধু বলিতেন :—

(১) সাহিত্য আর কিছুই নহে, মানুষ সমগ্র জীবন ভরিয়া যাহা কিছু উপলব্ধি ও অনুভব করে তাহাই মূর্ত্ত্য হইয়া সাহিত্যে বিকশিত হয়।

(২) সঙ্গীতের উদয় হয় কখন? যখন মানুষ একটা বস্তুকে পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহা পায় না, তখন তাহার কণ্ঠ দিয়া যে সুর উঠে তাহাই প্রকৃত সঙ্গীত।

(৩) যেখানে লোকের হৃদয়ে ভাবের অভাব থাকে সেইখানেই সে নানাপ্রকার উপমা দিয়া হৃদয়ের দৈন্যকে চাপিবার চেষ্টা করে।

(৪) যে কবিতা কবির হৃদয় হইতে উত্থিত হয় সে কবিতাকে নানাপ্রকার আড়ম্বর পূর্ণ ভাষা ও অলঙ্কার বিন্যাস দিয়া প্রকাশ করিতে হয় না, তাহা অনাড়ম্বর ভাষার মধ্য দিয়াও সুন্দর ফুটিয়া উঠে। খাঁটি কবিতার ভাব ও ভাষা পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

(৫) যাহারা জীবন ও মৃত্যুকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে তাহারাই মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু যাঁহারা জীবন ও মৃত্যুকে একই সুরে গাঁথা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারা মৃত্যুর নামে একটুও কম্পিত হন না। আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জলন্ত পাবক শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ্ ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

(৬) আমি বাঙ্গালার আধুনিক উপন্যাসাবলী অতি বিষ দৃষ্টিতে দেখি। আমি দেখিয়াছি আধুনিক উপন্যাসে কেবল পাশ্চাত্যের অবাধ প্রেম। এরূপ তীব্র বিষ যে দেশের উপন্যাসে ও সাহিত্যে দেদীপ্যমান, সে দেশের অধঃপতন অনিবার্য্য। আমি বাঙ্গালা উপন্যাস জগতে একজনও "নীলকণ্ঠ" দেখিলাম না ইহাই আমার দুঃখ।

(৭) অনেকে বলিতে পারেন বঙ্কিম ও গিরীশ কি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না? তাঁহাদের নাটক-নভেল কি ঘৃণ্য নহে? আমি বলিব বঙ্কিম ও গিরীশ পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইলেও বাঙ্গালীর প্রাণ লইয়া বাঙ্গালী ভাবে তাঁহারা নাটক-নভেল লিখিয়াছিলেন।

(৮) বাঙ্গালা—বাঙ্গালা। বাঙ্গালার আদর্শে ও ইউরোপের আদর্শে স্বর্গ ও নরক প্রভেদ। বাঙ্গালার সাহিত্য বাঙ্গালার আদর্শবাদ লইয়াই গঠিত হইবে; যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিদেশী বিপরীতমুখী, ভোগবিলাসমূলক আদর্শের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিবেন তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—তাঁহার সাহিত্য-সাধনার দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ না হইয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইবে। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বিষোগ্নিই প্রজ্বলিত হইবে।

(৯) বাঙ্গালার সাহিত্যকে বাঙ্গালীর প্রাণের বাণী দিয়া অভিসিঞ্চিত করিতে গেলে তাহাকে বাঙ্গালার বৈচিত্র্য দ্বারা লিখিতে হইবে। যে জাতি সাহিত্যে নিজের দেশের ভাবধারাকে অব্যাহত রাখে না, সে জাতির সাহিত্যের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

---

(১) সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য।

(১) নারায়ণই সকল ভোগ্যের ভোক্তা, সকল রসের আস্বাদনকারী, তাঁহার লীলা অনন্ত।

(৩) অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোক প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া শিখী যেমন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তেমনি বিপদের হুঙ্কারধ্বনি শুনিয়া মানুষ যে, তাহার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে।

(৪) অত্যাচারই অত্যাচারের সৃষ্টিকর্ত্তা। যে অপরের উপর অত্যাচার করে, অপরেও তাহার উপর অত্যাচার করিবে, এজন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হয়।

(৫) সত্য ব্যতীত এ জীবনে কেহই দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তিত্ব যেমন সত্যকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে, তেমনি জাতির জাতিত্বও সত্যকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে।

(৬) মুক্তির অন্বেষণই হইল ভারতীয় আত্মার চিরন্তন রীতি। ভারত সৃষ্টির আদিযুগ হইতে মুক্তি অন্বেষণ করিতেছে।

(৭) শুধু দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলেই হইবে না, পাপ হইতেও মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

———

দেশবন্ধুর বক্তৃতা

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছি, এইবার যে রাজনীতিক জীবনের জন্ত তিনি ভারতের অবিসম্বাদী নেতৃত্বের আসনে বসিয়াছিলেন, সেই রাজনীতির পরিচয় প্রদান করিতেছি :—

কলিকাতা খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই সভার সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া এই ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।

"উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইবার পূর্ব্বে আমি কয়েকটি কথা বলিতে' চাহি। আমি এই অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিয়াছি এবং আবার এখানে প্রতিবাদ করার জন্ত সমবেত হইয়াছি। আমাদের আইন অমান্ত করিবার ইচ্ছা নাই। আমাদের প্রতিবা'দ করিবার হেতু, গভর্ণমেণ্টের বে-আইনী কার্য্য সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, দেশবন্ধুর জবরদস্তী নহে, গভর্ণমেণ্টের জবরদস্তীই বর্ত্তমান অবস্থার জন্ত দায়ী। জবরদস্তী কিরূপ, তাহা আমি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি প্রাতে উঠিয়াই দেখিবেন যে, আপনার বাড়ী পুলিসপ্রহরী পরিবেষ্টিত।

যেমন আপনি বাড়ীর বাহির হইবেন, অমনি আপনি গ্রেপ্তার হইবেন। আপনি যদি গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে

উত্তর পাইবেন ৩ রেগুলেসন, আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন—আমি কি করিয়াছি? ইহার আর উত্তর কিছু পাইবেন না। তৎপরে আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নীত হইবেন। আপনি হয়ত পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু আপনি কিছুতেই কোন উত্তর পাইবেন না। আপনি তখন অবনত হইতে বাধ্য; কারণ যেখানে পুলিস ও সশস্ত্র ফৌজ বিদ্যমান—ইহা কি পাশবিক শক্তি নহে?

আমি বড়লাট এবং বঙ্গের লাটের বক্তৃতা বিস্মৃত হই নাই। বড়লাট অর্ডিনান্সের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, লর্ড লিটনও নিজ ভাষায় প্রতি ক্ষেত্রে—তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লর্ড লিটন কলিকাতায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং কলিকাতার বাহিরে গিয়া মালদহ ও দিনাজপুরে সেই এক বক্তৃতাই করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় বলিয়াছেন বিপ্লববাদীদের একটী দল হইয়াছে এবং যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহারা স্বরাজ-দলভুক্ত বলিয়া নহে, পিস্তল খরিদ, এবং বোমা নির্ম্মাণে জড়িত থাকার জন্যই গ্রেপ্তার হইয়াছে। মালদহে গিয়াও তিনি এই এক বক্তৃতাই করিয়াছিলেন। তিনি তথায় বলিয়াছিলেন আমাদের কার্য্য সঙ্গতই হইয়াছে, কারণ যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহারা বিপ্লবে লিপ্ত ছিল। দিনাজপুরে গিয়াও লর্ড লিটন গ্রেপ্তারের এই একই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তফাতের মধ্যে অধিকতর জোরের সহিত বলিয়াছিলেন। তারপর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একই কথা কেবলমাত্র অধিকতর ওজস্বিনী ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেন। সুতরাং লর্ড লিটন ঐ সকল লোক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই কথাই জনসাধারণকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। পুন পুনঃ

বলার জন্যেই কি তিনি মনে করেন যে, জনসাধারণ তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? কোন লোক আসিয়া আপনাকে বলিল, আমি ভূত দেখিয়াছি। আপনি তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সে আবার বলিল,—আমি ভূত দেখিয়াছি, আপনি এবারেও তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তখন লোকটি জোর গলায় পুনরায় বলিল—আমি ভূত দেখিয়াছি। লোকটি তখন ভাবিল, যখন বারবার বলিতেছেন, তখন এইবার তাহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছে। সুতরাং লাট সাহেবের বক্তৃতার উপর আমার উত্তর—না, না, না, তাহারা কখনই বিপ্লবমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নহে।"

লাট সাহেবকে আমি স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছি, যতদিন পর্য্যন্ত না আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সপ্রমাণিত হয় ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একজন মাত্র লোকও বিশ্বাস করিবে না যে, এই সকল লোক বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ভারতের সমুদয় গভর্ণর একযোগে যদি চীৎকার করেন—তাহা হইলেও জনসাধারণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিবে না।

লর্ড লিটন বলিয়াছেন যে, দেশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন বিদ্যমান, আমি এ কথা স্বীকার করিয়াছি। হাঁ, আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি এবং এখনও স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমলাতন্ত্রের বে-আইনী আইন ইহার দমন করিতে পারিবে না। অর্ডিনান্স এবং বে-আইনী আইনে ইহা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হউক, একজনের পর একজন করিয়া ৩ রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার হউক—তখন ভগবানের কৃপায় একদিন আমলাতন্ত্র দেখিতে পাইবে যে

আমার কথাই ঠিক আর সমগ্র বৃটিশ আমলাতন্ত্র ভ্রান্ত। আমলাতন্ত্র তুমি বলিবে, দমন আইনের ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন অবসান হইয়াছিল। তুমি কি ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর? তবে অনেক পুরাতন রাজবন্দী ৩ রেগুলেশন অনুসারে আবার কেন গ্রেপ্তার হইলেন? তবে কি গ্রেপ্তার ভুলক্রমে হইয়াছে, না তোমার কথাটাই ভুল? আমার কথা এই বিপ্লবমূলক আন্দোলন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। এবং কখনও ইহার অবসান হয় নাই, এখনও বর্ত্তমান আছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া না লইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এ আন্দোলন জীবিত থাকিবে।

লর্ড লিটন বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছিলেন তিনি আমাকে তাঁহার গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। আমার বক্তব্য তিনি আমাকে কোন দায়িত্ব দিতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন মন্ত্রীত্ব দিতে। লাট সাহেবের প্রতি আমার উত্তর, দায়িত্ব প্রদান না করিলে কোন আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা কিসের জন্যে সংগ্রাম করিতেছি? দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র লাভের জন্যই আমাদের এই সংগ্রাম! আমাকে যদি দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব প্রদান করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে কি আমি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতাম। আমি কর্ত্তার কথা অনুসারে চলিতে সম্মত নহি। তাহার কারণ আমার ব্যক্তিগত এবং ভারতীয় জাতীয়তার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান। লর্ড লিটন গভর্ণরের কার্য্যে অনভিজ্ঞ। যদি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বলিব, তাঁহার

এখনও শিখিবার জিনিষ অনেক বাকী। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় জাতীয়তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করা নিরাপদ নহে। আমি লর্ড লিটনকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, দমনমূলক আইনের ফলে এই সুপ্ত জাতীয়তা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিবে। লর্ড কার্জ্জনের ন্যায় লর্ড লিটনও বঙ্গে জাতীয়তাকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ, প্রস্তাবের অনেক বিষয়ের সহিত আমার মতের মিল নাই—কিন্তু অন্যান্য দল হইতে যে প্রকারে সমর্থন পাওয়া গিয়াছে, সেইজন্য আমি ইহা সমর্থন করিতেছি।

স্বরাজ্য দলকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালায় অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বরাজ্য দলের সহিত এই দুঃখ বরণ করিতে সকল সম্প্রদায়ই এখন সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রস্তাবের মধ্যে পৃথকভাবে স্বরাজ্য দলের যে নামোল্লেখ করা হয় নাই, সেইজন্য আমি সমবেত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত লিবারল দলকে অর্ডিন্যান্স স্পর্শ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা ব্যাপারটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। যাহা সত্য, তাহাকে যদি স্বীকারোক্তি বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, আমার দৃঢ় ধারণা, বাঙ্গালার বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু

বিদ্রোহী দলের অস্তিত্ব আছে। ইহা স্বীকার করিলেই অর্ডিনান্সের আবশ্যকতা আছে ইহা আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। বরং এই অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে সরকারের এই সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত ছিল। কারণ ইহাতে বিদ্রোহীদল শক্তিসম্পন্ন হইবে মাত্র। অতঃপর তিনি ডাক্তার বেসান্ত বড়লাটের স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন মোটর ডাকাতি মামলায় প্রমাণ ব্যতীতই আসামীর দণ্ড হইয়াছিল। জুরী ও সাক্ষীদিগের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছিল বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করি না।

পোষ্টমাষ্টার খুন ও গোপীনাথ সাহার মামলায় যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন ও যাঁহারা জুরীর কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভারতীয় ছিলেন। এই সকল স্থানেও কি প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছিল? মির্জ্জাপুর বোমার মামলা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীযুত দাশ বলেন, এই মামলার আসামী শান্তিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রায় দুইমাস হাজতে রাখা হইল। তারপর বিচারে সে অব্যাহতি পাইল। ইহার পরেই উহাকে খুন করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড দ্বারা বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণিত হয়? এই সম্পর্কে সন্দেহই বা হয় কি রকম? লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ একদল লোক হিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু হিংসায় কোন কাজ হয় না। তবে মানুষের প্রকৃতি মানুষের প্রকৃতিই বটে। বঙ্গভঙ্গের যুগে মুসলমানরা যখন উৎসাহে হিন্দুর গৃহ ধ্বংস করিত ও

তাহাদিগের বাড়ী ঘর কলুষিত করিত, সেই সময় জনসাধারণ অহিংসক থাকিবে ইহা কি আশা করিতে পারা যায়? পুলিসের অনাচারের জন্যই সেই সময় কেহ কেহ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্রোহী দলের অস্তিত্ব এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই স্বাধীনতার জন্য জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত, এমন অনেক যুবক থাকিবে। তাহারা স্বাধীনতার স্পর্দ্ধা বর্জ্জন করিবে, ইহা আপনারা আশা করিতে পারেন না। সরকারের বিদ্রোহদ্যোতক চালবাজীর নিন্দা না করিয়া বিদ্রোহী দলের নিন্দা করা হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রস্তাবের মধ্যে অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও আমি সম্মিলনকে ইহা সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অনেক সময় আমার নিকট এই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, আমরা যে স্বরাজ লইব তাহা সাম্রাজ্যের ভিতরে না বাহিরে হইবে? ঐ কথা জানিবার জন্য অনেক লোক অনেক সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি স্পষ্ট ভাবে সকল কথা জানাইতে চাই। আমি মুক্তি চাই, আমি স্বাধীনতা চাই। সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া যদি তাহা পাওয়া যায় তাহা হইলে সাম্রাজ্যের ভিতর থাকিতে আমার কোন আপত্তি নাই। সাম্রাজ্য অপেক্ষা স্বাধীনতাকে আমি অধিক ভালবাসি; কাজেই সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ না করা যায়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবে। কাজেই, ভবিষ্যতের সে কথা লইয়া এখন চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

অসহযোগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি অনেকস্থলে বলিয়াছি।

অসহযোগ অর্থে লোকে কি বুঝে, তাহা আমি জানি না; সর্ব্বত্র অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে স্বরাজ লাভ,—ব্যুরোক্রেশীর শাসন এখানে অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য আমরা সর্ব্বত্র বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন করিয়াছি—তাহাতে অহিংস অসহযোগ নীতি কখনও ক্ষুণ্ণ করি নাই। আমরা ব্যুরোক্রেশীর শাসন যন্ত্র শেষ করিয়া দিতে চাই, সেইজন্যই বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা অন্যায় হয় নাই। আমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া ব্যুরোক্রেশীর প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করিতে হইবে।

আমি আমার কার্য্যপদ্ধতি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। যে কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের স্বার্থের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে, আমরা তাহাকে ধ্বংস করিতে একটুও পশ্চাৎপদ হইব না। সরকারকে আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি—যে, আমাদের অধিকার প্রদত্ত না হইলে আমরা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে দিব না। সেই জন্য আমরা সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমাদের বাধা প্রদান নীতি চালাইয়াছি। মধ্যপ্রদেশে আমরা আমাদের নীতি চালাইয়া সরকারী শাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছি। বাঙ্গালাতেও আমরা ঐ নীতি চালাইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস, এখানেও শাসন যন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে। আমরা যে আন্দোলন চালাইয়াছি, তাহা বৈধ কি না—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের লোক শাসন সংস্কার লইতে সম্মত হয় নাই। তাহা ধরিলে এ নীতি বৈধ হয় না—কিন্তু শাসন-সংস্কার আইন মানিয়া লইলে এ আন্দোলন সম্পূর্ণ বৈধ। আমরা মন্ত্রীর বেতন না-মঞ্জুর করিব।

তখন সরকার যেরূপ পথ অবলম্বন করিবেন, আমাদেরও সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সময় ও অবস্থা বুঝিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। আমরা এ দেশ হইতে দ্বৈতশাসন তাড়াইব। যতক্ষণ না সরকার আমাদের দাবী গ্রাহ্য করেন, ততক্ষণ আমরা ঐ নীতি চালাইতে থাকিব।

আপনারা সকলেই পড়িতেছেন, শাসনসংস্কার তদন্ত কমিটিতে মন্ত্রীরা সকলেই মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন। কাজেই সরকারের হস্তান্তরিত বিভাগগুলি যদি সংরক্ষিত বিভাগের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। মন্ত্রীর পদ উঠাইয়া দিয়া সরকারকে যদি শাসন পরিষদের দ্বারা সকল কাজ চালাইতে হয়, তাহাতে কাহারও দুঃখ করিবার কারণ নাই, বরং সকলের সুখী হওয়া উচিত।

মিশরে জনগণের দাবী রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আজ যদি ইংরেজ দ্বৈত-শাসন উঠাইয়া একই লোকের দ্বারা দুই ভাগের শাসন কার্য্য চালান, তাহা হইলে সরকারের ভিতরের রহস্য প্রকাশ হইয়া যাইবে, এবং আমরা বুঝিব যে স্বরাজলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই।

কার্য্য-পদ্ধতি

দুই বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে দল গঠন করিবার সময় আমরা যে কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলাম, তদনুসারে স্বরাজ্যদল কাজ করিয়াছেন। আমাদের কোন বাধাবাঁধি নিয়ম মানিয়া চলিলে হইবে না—কারণ সরকার মধ্যে মধ্যে নিয়ম বদলাইতেছেন, আমাদেরও তদনুসারে কার্য্য-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা কখনও সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হইব না। যাহা দ্বারা স্বাধীনতার সংগ্রাম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে বাধা দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বৈতশাসন মারা গিয়াছে—যদি তাহা আবার বাঁচিয়া উঠে, তাহা হইলেও আমাদের আবার প্রমাণ করিতে হইবে যে, দ্বৈতশাসন মরিয়া গিয়াছে। সরকার সে কথা জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহা বলিতে সাহস করেন না। আমরা জানি যে ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা উৎকোচ গ্রহণ ও অসৎনীতি অনুসারে কাজ করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এই ভাবেই সত্যকথা চাপা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা বন্ধ করিবার জন্যই এরূপ কথা বলা হইল। এংলো ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজগুলি ঐ প্রকারের গুজব রটাইয়া ঐ প্রকারের জাল ও মিথ্যা সংবাদ বিলাতে পাঠাইয়াছিল। তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির

অন্য সকল কাজই করিতে পারে। আমি ঐ মিথ্যা গুজবকে ভয় করি না। আমি ঐ সকল গালাগালি খাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি জানিতাম যে, সরকারের কাজে বাধা দিতে গেলেই আমাদিগকে নানাপ্রকার কথা সহ্য করিতে হইবে। আপনারা সকলেই সাধ্যমত স্বরাজ্য দলকে সাহায্য প্রদান করুন। আমি জানাইতেছি যে, স্বরাজ্য দলের কেহ কাউন্সিলে স্বার্থসিদ্ধির কোন চেষ্টা করিবে না। যদি দেশের লোক স্বরাজ্যদলকে সাহায্য প্রদান করে, তাহা হইলে আমরা ব্যুরোক্রেশীর হাত হইতে সকল অধিকার কাড়িয়া লইতে পারিব। আমি গত ২০ বৎসর ধরিয়া যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়াছি, মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানের কৃপায় তাহা যেন লাভ করিতে পারি—ইহাই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

এইবার তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের কথা বলিব। এই সত্যাগ্রহে দেশবন্ধু যে অকুতোভয়তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন তাহা ভারতের ইতিহাসে নূতন। কিভাবে চিত্তরঞ্জন দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন সে কথা বলিবার পূর্ব্বে তারকেশ্বর তীর্থের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই তীর্থক্ষেত্র কলিকাতা

হইতে রেলপথে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। হুগলী জেলায় এই তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। এই তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভারামল্ল সিং। তিনি পশ্চিমদেশের একজন রাজার ভ্রাতা, পাঠানের অত্যাচারের ভয়ে তিনি তারকেশ্বরের নিকটে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি পয়ঃস্বিনী গাভী ছিল, তাঁহার ভ্রাতা সেই গাভীটি চরাইবার নিমিত্ত প্রতিদিন তারকেশ্বরের বনে লইয়া যাইতেন, সেই বনে মৃত্তিকায় প্রোথিত একখানি শিলাখণ্ড ছিল, সেই শিলাখণ্ডেব উপব গাভীটি দাঁড়াইবা মাত্র তাহার বাঁট হইতে অজস্র ধারে দুধ গড়াইয়া পড়িত। রাজা ভারমল এক দিন নয়—দু'দিন, তিনদিন করিয়া এইভাবে গাভীটির বাঁট হইতে দুগ্ধ গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া রাজার নিকট আসিয়া তাহা বলিলেন। রাজা নিজে সেই বনের মধ্যে যাইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার পয়ঃস্বিনী গাভীটি আসিয়া একটি শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইল আব সেই গাভীটির দুগ্ধে পরিপূর্ণ বাঁট হইতে অজস্র ধারায় দুধ পড়িতে লাগিল। রাজা ভারামল সেইদিন রাত্রেই স্বপ্ন যোগে দেখিলেন, সেই শিলাখণ্ড স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। রাজা ভারামল পরদিন লোকজন লইয়া সেই শিলাখণ্ডকে তুলিবার জন্য কত টানাটানি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। সেই দিন রাত্রে রাজা ভারামল্ল পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহাকে বলিতেছেন, আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টা না করিয়া যেখানে আমি আছি, সেইখানে আমার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার নিত্য পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা কর। রাজা ভারামল্ল তাহাই করিলেন। তদবধি সেইখানকার বন জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া সেখানকার

নাম "তারকেশ্বর" নামে অভিহিত হইল। সেই সময়ে "মোহান্তা" নামধেয় একজন সন্ন্যাসী পশ্চিম দেশ হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাবা তারকনাথের পূজার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। রাজা ভারামল্ল তাঁহাকেই বাবা তারকনাথের সেবাইত বা পূজারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি মাধবগিরি পর্য্যন্ত মোহান্তগণ বাবা তারকনাথের পূজার্চ্চনা করিয়া আসিতেছিলেন। এই মাধবগিরির সময়ে একটা ভয়াবহ রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনা হইতে তার-কেশ্বর তীর্থে ব্যাভিচারের কাহিনী দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঘটনাটি এই, এলোকেশী নাম্নী তারকেশ্বর অঞ্চলে একটি অতি সুন্দরী যুবতী ছিল। সেই যুবতীর অসামান্য রূপসৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মাধব-গিরি তাহার সতীত্বনাশের জন্য তাহাকে নিজের মঠে ধরিয়া আনে। এলোকেশীর স্বামী তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পত্নীর এইরূপ বিপদের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তারকেশ্বরে গেলেন। মাধবগিরির লোকবল অত্যন্ত অধিক, তারকেশ্বর অঞ্চলে এমন কেহ ছিল না যে, মাধবগিরির বিরুদ্ধে একটি কথা বলে। এলোকেশীর স্বামী যখন দেখিলেন যে কোনমতেই তিনি পত্নীর সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি একখানা সুতীক্ষ্ণ বটী দিয়া নিজের পত্নীর শিরশ্ছেদ করিলেন। বিচারে তাহার চরম দণ্ড হইল। আর মাধব-গিরির মাত্র ৬ মাস কারাদণ্ড হইল। মাধবগিরি জেলে যাইয়া ঘানী-গাছ ঘুরাইয়া যে তৈল প্রস্তুত করিত তাহা বাজারে মাধবগিরির তৈল বলিয়া দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইত! আবার এলোকেশী সাড়ী, এলোকেশী পাড় বলিয়া নূতন নূতন ধরণের কাপড় বাজারে বিক্রয় হইত। আশ্চর্য্যের

বিষয়, মাধবগিরি কারাগার হইতে বাহির হইবামাত্র দেশবাসী আবার তাহাকে গদীতে বসাইয়া পূজা করিতে লাগিল। আর তারকেশ্বর তীর্থের এত বড় একটা অনাচার-কাহিনীও লোকে ভুলিয়া গেল। এই মাধবগিরির মৃত্যু হইলে তাহার শিষ্য সতীশ গিরি তারকেশ্বরের গদীতে বসিল। তারকেশ্বর তীর্থের গদীতে বসিয়াই সে তাহার পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত দৈন্যের ইতিহাস ভুলিয়া গেল। সে পূর্ব্বে একটা জমিদারী ষ্টেটের দারওয়ান ছিল, শোনা যায় সে কিছুদিন রেল ষ্টেশনের পাণিপাঁড়ের কাজও করিয়াছিল, তখন তাহার নাম ভায়ারাম পাঁড়ে ছিল। সেই সতীশগিরি যখন তারকেশ্বরের গদীতে বসিয়া লক্ষাধিক টাকার দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকার পাইল তখন কি আর সে প্রভুত্ব না দেখাইয়া পারে? শোনা যায়, সে জমিদারের মত রীতিমত পাইক পেয়াদা রাখিয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। বাজারের ছোট ছোট দোকানদারদের উপর তোলার ব্যবস্থা করিল, ইহা ছাড়া তীর্থযাত্রীদের উপব নানারূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে নানাভাবে টাকা আদায় করিতে লাগিল, তীর্থযাত্রীরা কেহ বিসূচিকায় মারা গেলেও মহান্তের লোক ভুলক্রমেও তাহাদের দিকে তাকাইত না। দারুণ চৈত্রমাসের গরমে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও কাহাকেও একবিন্দু জল দেওয়া হইত না। একই পুষ্করিণীতে পুরুষ স্ত্রী উভয়কেই স্নান করিতে হইত। কেহ রীতিমত দর্শনী না দিতে পারিলে তাহার ভাগ্যে আর বাবা তারকনাথ দর্শন করা ঘটিত

না। তাহাকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

আবার এমনি মজা যে সুন্দরী স্ত্রীলোক লইয়া নিরাপদে কাহারও একাকী তারকেশ্বর তীর্থে যাইবার উপায় ছিল না। শোনা যায়, ১৯২৩ সালে হাওড়ার একজন উকীল তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া তারকেশ্বরের তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে যান। একটী ঘরে তাঁহারা বাসা লন, তারকেশ্বরের মহান্তের লোক তাঁহার স্ত্রীকে সেই ঘরে তালা বন্ধ করিয়া আটক কবিয়া রাখে। এদিকে তাঁহার স্বামীকেও অন্যত্র আটক করিয়া রাখা হয়। স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে একখানা অস্ত্র (দাও) পান, তিনি সেই অস্ত্র দিয়া ঘরের পিছনের দিকের বাঁশের বাতা কাটিয়া দৌড়িয়া রেল ষ্টেসনে আসেন। রেল-ষ্টেসনে দুইজন সাহেব ছিলেন। তাঁহারা শীকার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটি আসিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহাদের পা জড়াইয়া ধরে, তখন সে সাহেব দুইজন স্ত্রীলোকটিকে এবং তাঁহার স্বামীকে রক্ষা করেন। এই ঘটনা বাঙ্গালার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালাদেশে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় নিজে তারকেশ্বরে যাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, তারকেশ্বর তীর্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত কলঙ্কের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সে সমস্তই সত্য। তখন তিনি এ বিষয়ে কলিকাতার নানা পার্কে সভা করিয়া জনমত গঠন করিতে থাকেন। ক্রমে তাবকেশ্বর সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা আলোচনা হইতে

থাকে। স্বামী বিশ্বানন্দ ও ৺স্বামী সচ্চিদানন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় তারকেশ্বরের আন্দোলন ক্রমে বিরাট আকার ধারণ করে। ৺স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দ তারকেশ্বর ঘুরিয়া আসিয়া তথা অহিংস সত্যাগ্রহ করিবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহাদের আহ্বানে কেহই সত্যাগ্রহ করিতে অগ্রসর হয় না, ব্রাহ্মণসভাকে আহ্বান করিয়া স্বামীজিদ্বয় তারকেশ্বরের ব্যাপাব গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসভা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন স্বামীজিদ্বয় তেল-কল ঘাটেব কুলীদের লইয়া একটী সত্যাগ্রহ কমিটীর দল গঠন করিয়া তারকেশ্ববে সত্যাগ্রহ করিতে সঙ্কল্প করেন। ইত্যবসরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু তারকেশ্বরে যাইয়া সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পান যে, সত্য সত্যই তারকেশ্বরে ধর্ম্মের নামে একটা প্রবল ব্যভিচার চলিতেছে। তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করিবার কথা ঘোষণা করেন। তদুপলক্ষে ১৩৩১ সালে ১লা আষাঢ় কলিকাতাস্থ মির্জ্জাপুর পার্কে একটি বিরাট জন সভায় নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা করেন!

"তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুধু বাঙ্গালীজাতিরই সংগ্রাম নহে, সমগ্র ভারতবাসীরই ইহাতে যোগদানের অধিকার আছে। অনেকে সত্যাগ্রহ এই নামটায় একটা আপত্তি তুলিয়াছেন, আমি ইহাকে সত্যাগ্রহ না বলিয়া সত্যাশ্রয়, ধর্ম্মাশ্রয় বলিতেও প্রস্তুত আছি। বাঙ্গালার হিন্দু, আজ তোমার দেবতার মন্দিরে তোমাদের

প্রবেশাধিকার নিষেধ, তোমাদের তীর্থক্ষেত্র বিপন্ন, কলুষিত, এখনও কি তোমরা নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিবে? ধর্ম্ম সংগ্রামে যোগদানের জন্য আজও কি তোমাদের অসারতা নিজ্জীবতা ভঙ্গ হয় নাই? আজ তারকেশ্বরে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে শুধু মানুষ চাই—প্রাণ দিতে পারে এমন মানুষ চাই। এ সংগ্রামে বাঙ্গালীকে তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইবে, জীবন দিয়াও এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে। আমরা হিংসা নীতি অবলম্বন করিতে চাহি না, আমরা নিরুপদ্রব নীতিকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিয়া এই সংগ্রাম পরিচালনা করিতে চাই। আমি আশাকরি বাঙ্গালী আজ জাগিয়াছে। ধর্ম্মের উপর অত্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার, বাঙ্গালী আর সহ্য করিবে না। এখনও যদি না জাগিয়া থাকে তবে এমন একদিন আসিবে যেদিন বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। যদি আপনারা আমায় আদেশ করেন তাহা হইলে আমি নিজে জেলে যেতে প্রস্তুত আছি, জীবন দিয়াও এ আন্দোলন চালাইতে হইবে। ভয় কি? ধর্ম্মের জন্য আত্মদানে এত কুণ্ঠা, দ্বিধা, আশঙ্কা কিসের! মানুষ চাই—এমন গোটা মানুষ চাই, যে অসঙ্কুচিত চিত্তে বল্‌তে পারে, এ প্রাণ বিধাতার দেওয়া,—বিধাতার কার্য্যেই উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। বাঙ্গালা দেশে কি মানুষ নাই? আজও কি ধর্ম্মের এ আহ্বান কেহ শুনিতে পাও নাই? যদি না পেয়ে থাক তবে শোন, জাগ, ওঠ, যার প্রাণে শক্তি আছে। শক্তি চাই—শক্তি দাও, শক্তি দাও; শক্তি দাও—তবেই সব চেষ্টা সিদ্ধ হইবে। সন ১৩৩১ সালে ২২শে আষাঢ়, রবিবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লর্ড লিটনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন চুঁচুড়ায় বক্তৃতাকালে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। জানি না পাশ্চাত্য রাজনীতির চালবাজীতে সত্যের কতখানি অপমান করিবার সীমা নির্দ্দেশ করা আছে, আমি কিন্তু এ কথা স্বীকার করিবই যে লাট বাহাদুরের বক্তৃতা আমাকে অতিমাত্র বিস্ময় চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। দেবস্থানে পবিত্রতা রক্ষার জন্য হিন্দুদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর যে সত্যাগ্রহের ভিত্তি স্থাপিত সেই সত্যাগ্রহই এক "বিকট উপহাস" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এবং এই বিরাট বিদ্রূপাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠাতা দেশের কতকগুলি অব্যবস্থিত চিত্ত রাজনীতিক। দেশের ইংরাজের সংবাদ পত্র আমাকে ইহার পূর্ব্বে বহুবারই গালি দিয়াছে, সুতরাং এ আমার পক্ষে কিছু নূতন নহে। কিন্তু প্রদেশের গভর্ণরের পক্ষ হইতে আমায় গালিবর্ষণ এই নূতন। আমি জানি না, গভর্ণর বাহাদুর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কিংবা অন্য ধর্ম্মে আস্থাবান—কিন্তু আমি হিন্দু, আমার ধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে, এবং আমি আমার সেই ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য আমার জীবন পাত করিতে প্রস্তুত। যে কংগ্রেস কমিটীর উপর এই আন্দোলন চালাইবার ভারার্পণ করা হইয়াছে,- তাহার সদস্যবর্গ ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু। আমাদের শক্তি সামর্থ্য যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে আমরা কখনই এই অপবাদ সহ্য করিব না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে গভর্ণর সাহেবও রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ মিথ্যাপবাদ ঘোষণার জন্য জনসাধারণ ক্ষতিপূরণ দাবী করিতেছে।

এ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে কেবল নিরপেক্ষ দর্শক এ কথাও সত্য

নহে। কারণ গভর্ণমেণ্ট মোহান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অন্যায় এবং বেআইনী। ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করিলেন, কিন্তু মোহান্তের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাহার প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মাগ্রাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াও অব্যাহতি লাভ করিল।

তাহাদের নামে অভিযোগ পর্য্যন্ত আনা হইল। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ যে সম্পূর্ণ অবৈধ তাহা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মামলার বিচারকালে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল ঘটনার পরও কি গভর্ণমেণ্ট বলিতে চান তাঁহারা এ ব্যাপারে মর্ম্মাহত দর্শকমাত্র ?" এ সকল ঘটনা কি লাট বাহাদুরের শ্রুতিগোচর হয় নাই ? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহারা দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের উপর এই অপমান এবং তিরস্কারের বোঝা চাপাইবার পূর্ব্বে ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির বিগত শতবর্ষ ধরিয়া সাধারণের সম্পত্তি ভাবিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, সে সংবাদ কি লাট বাহাদুর রাখেন ? এখন এই মন্দিরে সাধারণের পূজার্চ্চনা করিতে প্রতিবন্ধকতা করায় কি ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না। এক্ষণে মোহান্ত রিসিভার বা অন্য কর্ম্মচারী যদি এই দেবস্থানকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন, তবে তাহাই কি যথেষ্ট হইবে ? আমার বিশ্বাস লাট বাহাদুর শত চেষ্টা করিলেও এই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বা প্রাসাদ যে মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি একথা একজন হিন্দুকেও বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না।

হিন্দুমতে যাহার আস্থা আছে এমন কোন ব্যক্তিই তারকেশ্বর দেব বিগ্রহের সম্পত্তির এমন অপব্যবহার কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। পুলিশ কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগকে মন্দির প্রবেশে বাধা দেওয়াতে সরকারের যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় হউক, উহার প্রতিবাদ করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হইবে না। লাট সাহেব হয়ত ভাবিয়াছেন কিংবা হয়ত তাঁহার পরামর্শদাতৃগণের স্বপরামর্শে বুঝিয়াছেন যে, যখন রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছে, তখন সত্যাগ্রহীদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা রিসিভার বা আইন আদালতের ধার ধারে না এবং তাহারা জানে দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশে যাহার অর্থ আছে—পরিণামে আদালতে তাহার পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ লাট সাহেব সত্যাগ্রহ করার কথা অবগত নহেন। যদি জানিতেন তাহা হইলে এই আন্দোলনের উপর এভাবে কটূক্তি বর্ষণ করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিতেন।

লর্ড লিটন বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, আমার মতে তাহা দেশবাসীর পক্ষে বড়ই অপমানের কথা। আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি, তাহারা যেন মুক্তকণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত বলেন, আমরা আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ হস্তক্ষেপ চাহি না—তা সে হস্তক্ষেপকারী যত বড লোকই হউন না কেন।

সত্যাগ্রহে পুত্র প্রদান

দেশবন্ধুর এই বক্তৃতার পর তারকেশ্বরে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত হন। দেশবন্ধুর আহ্বানে দলে দলে যুবকগণ সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করে। স্বামী বিশ্বানন্দ ও ৺স্বামী সচ্চিদানন্দ দুইজনে তারকেশ্বরে থাকিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে পরিচালিত করেন। প্রতিদিন দশজন করিয়া সত্যাগ্রহী যুবক মোহান্তের প্রাসাদ মধ্যস্থ মন্দিরে প্রবেশ করিতে যায়, কিন্তু প্রাসাদের প্রধান ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া অভিযুক্ত করিতে থাকে। এইভাবে কিছুদিন চলিতে থাকে। দলে দলে যুবকগণ ধর্ম্মস্থান রক্ষার জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। তারকেশ্বর তীর্থ তখন সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দেশবন্ধু শুধু দেশের যুবকগণকে সত্যাগ্রহে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া নিরস্ত ছিলেন না। তিনি আপন পুত্র চিররঞ্জনকে সত্যাগ্রহ যজ্ঞে প্রেরণ করিলেন। চিররঞ্জন হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করিলেন। দেশবাসী বুঝিল দেশবন্ধু নিজে যাহা বলেন তাহা কার্য্যতঃ নিজে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। দেশবন্ধু আবার মির্জাপুর পার্কে একটি সভার অধিবেশন করিয়া ১৩৩১ সালের ২৫শে আষাঢ় জলদগম্ভীর নাদে ঘোষণা করিলেন—"কংগ্রেস তারকেশ্বরের আন্দোলন-ভার গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণসভা

কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কেন? কংগ্রেস কি হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নহে? দেশবাসীর ধর্ম্মের সহিত কংগ্রেসের কি কোনই সম্পর্ক নাই? কংগ্রেস কি হিন্দু ছাড়া? তারকেশ্বরের আন্দোলন-ভার গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস কি একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? ব্রাহ্মণ-সভা বলিয়াছেন, আমি হিন্দু নই, হিন্দুর ধর্ম্মান্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই। আমি বলিব, আমার হিন্দুত্ব মারে কে? যাঁহারা আজ হিন্দুত্বের, ব্রাহ্মণত্বের বাজে বড়াই করেন, কই তাঁহারা ত এ আন্দোলনের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই?

এ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ ত তাঁহারা পাইয়াছিলেন? তবে কেন হিন্দুত্বের গৌরব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে তারকেশ্বরে যাইয়া আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন নাই? আমি যে হিন্দু, আজ তাহার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। যাঁহারা হিন্দুত্বের বড়াই করেন, তাঁহারা আজ তীর্থস্থানকে অত্যাচারের কবল মুক্ত করিবার জন্য যে শাস্তি বরণ করিবেন আমি তাঁহাদের অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি বরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আজও যদি তাঁহারা এই আন্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সানন্দে সে ভার তাঁহাদের করে ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছে! আজ ব্রাহ্মণ-সভা বা যে কোন হিন্দু প্রতিষ্ঠান আন্দোলন ভার গ্রহণ করুন, আমি সানন্দে তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কাজ করিব এবং তাঁহাদের আদেশ পাইলে স্বয়ং সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আত্মাহুতি প্রদান করিব। আমি মোহান্ত

রাখার প্রথা তুলিয়া দিতে চাই বলিয়া চারিদিকে একটা জনরব উঠিয়াছে। এই জনরব একেবারে ভিত্তিহীন। মোহান্ত রাখার প্রথা তুলিয়া দিতে আমি চাই না, আমি চাই—শুধু অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী মোহান্তকে দূর করিয়া দিতে—হিন্দুর জন্য পীঠস্থানকে কলুষ মুক্ত করিতে! বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সাধনার ভিতর যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, সে সমস্তের উপর অন্য কাহারও অপেক্ষা আমার কম সহানুভূতি নাই। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জীবন্ত সত্য। লক্ষ্মী নারায়ণ-জীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হিন্দু মাত্রেরই আছে। ব্রাহ্মণ সভার কোন সভ্য কি এ অধিকারকে অস্বীকার করিতে চান্? ঐ অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণসভার কোন সভ্য কি লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইতে গিয়াছিলেন?

বাঙ্গালার লর্ড লিটন কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, সত্যাগ্রহকে বিদ্রূপ করিয়া অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এমন অযোগ্য শাসনকর্ত্তা সসম্মানে লাটগিরি হইতে অবসর গ্রহণ করুন। আর হিন্দু! তোমরা যদি লাটের এ বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তির অহঙ্কারিতা আত্মম্ভরিতার প্রকৃত উত্তর দিতে চাও ত দলে দলে যাইয়া তারকেশ্বরে গ্রেপ্তার বরণ কর, দেখাইয়া দাও বাঙ্গালার অযোগ্য শাসককে যে, এ আন্দোলন Colossal hoax নহে, বাঙ্গালার—বাঙ্গালী তথা সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণের আন্দোলন।

কিন্তু দেশবন্ধুর এই আকুল ক্রন্দনে ব্রাহ্মণসভার মন টলিল না। ব্রাহ্মণ-সভা মোহান্তকে পদচ্যুত করিবার জন্য অন্য আরামজনক সহজ উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা হুগলীর জজ আদালতে তারকেশ্বরে রিসিভার

নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিলেন। বিচারে তাঁহাদের জয় হইল তারকেশ্বরের মন্দিরাদির জন্য একজন রিসিভার নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সত্যাগ্রহী দল তখন রিসিভারকে আমল দিলেন না, রিসিভা দখল পাইলেন না, সত্যাগ্রহ চলিতে লাগিল। শেষে ব্রাহ্মণসভার জয় হইল। তাঁহারা এবার তারকেশ্বরেব সমগ্র সম্পত্তির উপ রিসিভার নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিলেন, তাঁহাদের দরখা মঞ্জুর হইল। তারকেশ্বরের সমস্ত সম্পত্তির উপর রিসিভা নিয়োগের আদেশ হইল। তখন দেশবন্ধু অসুস্থাবস্থায় দার্জিলিং অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পূর্ব্বে দেশবন্ধুর আত্মিক বলের নিক পরাস্ত হইয়া মোহান্ত সতীশ গিরি গদীত্যাগ করিয়া দেশের কাজ ক করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। সতীশ গিরির চেলা প্রভা গিরিকে গদীতে বসাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কথা ছিল প্রভাত গিরি যদি কখনও কোনরূপে যাত্রীদের অথবা প্রজাদের প্র অত্যাচার করে, কোন যাত্রীর মুখে যদি কোন অভিযোগ প্রকা পায় এবং সে অভিযোগ যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তা হইলে প্রভাতগিরিকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করা হইবে। এই স সতীশ গিরি রাজি হইয়াছিল—এই সর্ত্তে দেশবাসী সম্মত হইয়াছি কিন্তু ব্রাহ্মণসভা তাহা শুনিলেন না। তাঁহারা রিসিভার চাহিলে রিসিভারই পাইলেন, ফলে দেশবন্ধুর সর্ত্ত বাতিল হইয়া গেল। ব মর্ম্মাহত হইয়া দেশবন্ধু দার্জ্জিলিংয়ে রোগ শয্যায় শুইয়া মহাত্মা গান্ধী সহিত পরামর্শ করিয়া সত্যাগ্রহ পুনরায় আরম্ভ না করার জন্য আদে করিলেন। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের যবনিকা এইখানেই পতিত হইল

সত্যাগ্রহ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ইহাতে দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের মহিমা দেশবাসীর নিকট প্রকট হইল। দেশবন্ধুর আহ্বানে মাতা আপন হস্তে পুত্রকে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন—পিতা আপন হস্তে পুত্রের গলে বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়া সত্যাগ্রহে পাঠাইলেন—পত্নী স্বামীকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে সত্যাগ্রহ যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য পাঠাইলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে দেশবাসীর উপর চিত্তরঞ্জনের কত প্রভুত্ব। তাহার মুখের কথায় কারাবরণ করা ইহা কি নিতান্ত সামান্য কথা! চিত্তরঞ্জন যে বাঙ্গালার অবিসম্বাদী প্রধান নেতা তাহা এই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেই প্রমাণিত হইল। দেশবাসী বুঝিল চিত্তরঞ্জন শুধু দেশের মুক্তি কামনায় আত্মোৎসর্গ করেন নাই, তিনি হিন্দুধর্ম্মের জন্য—তীর্থ ক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্যও অনুপ্রেরণা অনুভব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দেশবন্ধু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের পুত্র হইয়াও বিরাট উদারতাগুণে সমস্ত ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও তাহার বিশাল উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

———

গান্ধী শিষ্য চিত্তরঞ্জন

মহাত্মা গান্ধীপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব বাহির হইতে দেখিতে গেলে যতটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, মানসিক বিকাশ ও চরিত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা একটা স্বাভাবিক ও সহজ পরিণতি মাত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিয়াছিলেন যে, সাহিত্যের মধ্যে এই মনুষ্যটির প্রাণ সর্ব্বদা এক মহা মৌন তপস্যার মধ্যে ডুবিয়া আছে। ত্যাগের জন্য ভক্ত সাধক চিত্তরঞ্জন তখন আপন মনে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিসের আশায়? কিসের আশায় যে তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহা—তখনও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি ১৯০৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনও তাহা নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কাব্য ও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লইয়া তিনি বাঙ্গালী সভ্যতার ও বাঙ্গালার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যে আত্মসমাহিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে তাহার প্রাণ-ধর্ম্মে আপন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই বঙ্কিমের পর এই প্রাণধর্ম্মী কবি একটা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন সাহিত্যের মধ্য দিয়া ক্রমে রাজনীতিক ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাব্যের ভিতর দিয়া

তিনি যে ভাব-দাসত্ব হইতে মানবকে মুক্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া-ছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহাত্মা গান্ধীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রতীচ্য-ভাব-দাসত্ব হইতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাব্যের ভিতরে চিত্তরঞ্জনের যে স্বর ব্যক্ত হইয়াছিল সেই স্বরই রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই। কাজেই মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করিতে গিয়া চিত্তরঞ্জন সহসা রাজনীতিক হইয়া ফুটিয়া উঠেন নাই। তিনি আপনার জীবন-পথে চলিতে চলিতে পথিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার পান।

অনেকে বলেন, ১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন হঠাৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে উপস্থিত হন—ঐ বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে মহামতি দাদাভাই নৌরজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই কংগ্রেসে আমরা চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে পাই। ঐ কংগ্রেসে জাতীয় দল কংগ্রেস বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির বৈঠক হইতে তাঁহাদের ইচ্ছামত বয়কট মন্তব্য চালাইতে না পারিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের বিস্তীর্ণ আইন লাইব্রেরীর মন্ত্রণাকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন স্বদেশী যুগের অগ্রগামী নেতৃবৃন্দের সহিত এক সঙ্গে এক মন্ত্রণা-গৃহে আবদ্ধ। ঐ বৎসরের পর হইতে কংগ্রেসের বৈঠকে চিত্তরঞ্জন নিয়মিতরূপে উপস্থিত হন নাই। যদি এই ঘটনা দ্বারা কেহ প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হন যে ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ বৎসর কংগ্রেসে উপস্থিত হন

নাই বলিয়া চিত্তরঞ্জন রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তবে তাহা তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি আলোচনা করিয়া বলিতে গেলে সত্যকথা বলা হইবে না। প্রথমতঃ যে কয় বৎসর স্বদেশী যুগের কোন অগ্রগামী নেতাই কংগ্রেসে যান নাই বা যাইতে পান নাই, সেই কয় বৎসর চিত্তরঞ্জনকে কংগ্রেস-মণ্ডপে অনুপস্থিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার বা অভিযোগ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। যে দলের যে মতের রাজনৈতিক তিনি ছিলেন, সেই দলকে সেই মতকে তিনি পরিত্যাগ করিলেই ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর তিনি কংগ্রেস বৈঠকে আসিবার এবং সম্মানের সহিত উচ্চ মঞ্চে বসিবার সুযোগ করিয়া লইতে পারিতেন। তাহা তিনি করেন নাই, কেননা এই কয় বৎসর "চিত্তরঞ্জন তাঁহার রাজনৈতিক দল ও মতকে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত একমনে এক প্রাণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। এই কয়েক বৎসর যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাকে কংগ্রেস না বলিয়া বাংলা কথায় বরং মেটা মজলিস ও বাৎসরিক আড্ডা বলিলেই শোভনীয় হয়। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের নামে এই আড্ডা বা মজলিসে উপস্থিত হন নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে কংগ্রেস ছিল না। কংগ্রেসের নামে সৌখীন মডারেট দলের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচার ছিল। চিত্ত-রঞ্জন যে সেই সমস্ত "কংগ্রেসী মজলিসে," উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ বাঙ্গালায়—তথা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় চিত্তরঞ্জন ছিল না। মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর তাঁহাকে যেরূপ এই কালের মধ্যেই রাজদ্রোহিতা মামলায় ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত

থাকিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মডারেট মজলিসে যোগ না দেওয়ায় বিশেষ অপরাধী করা যায় না। এই সময় এক একদিন এমনও হইত যে, তিনি নিজের স্ত্রীর সহিতও সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ পাইতেন না। সুরাট কংগ্রেস-মণ্ডপে জাতীয় দলের অবমাননার পর হইতে দ্বাদশ বৎসর চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস-মণ্ডপে যাওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। এই দ্বাদশ বৎসর জাতীয় দল রাজনীতিক কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রাজদ্বারে ও কারাগারে এবং নানাক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে যে ক্ষেত্রে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে পাই। ধর্ম্মে এবং সাহিত্য চর্চ্চায় তিনি স্বদেশীর কোন নেতা অপেক্ষাই কম নন। অথচ দেশের রাজনৈতিক বিপদের দিনে তপস্বী মডারেটদের ন্যায় আমরা অযথা তাঁহাকে নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে দেখি নাই। স্বদেশী মন্থনের ফলে ষড়যন্ত্র-বাদরূপ যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল—যাঁহারা সেই হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা—সেই সব ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ একে একে সব খসিয়া পড়িয়াছিল, কেবল একমাত্র চিত্তরঞ্জনই নীলকণ্ঠের মত সেই হলাহল পান করিয়াছিলেন। তিনি না থাকিলে অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র প্রভৃতি লোকের দশা যে কি হইত তাহা কে জানে? তিনি না থাকিলে কত শত অন্তরীণ যুবকের স্ত্রী-পুত্র পরিবার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির দশা যে কি হইত তাহা কে জানে? এই কয়েক বৎসর যদি এই সব রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সাধনে চিত্তরঞ্জন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং সেজন্য যদি তিনি "মডারেটদের মজলিস"রূপ আড্ডায় উপস্থিত

হইতে না পারিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কোন অপরাধে অপরাধী করা যায় না; বরং তিনি যে একটা "বাক্ সর্ব্বস্ব" সম্প্রদায়ের আড্ডায় যাইয়া বৃথা বাক্য ব্যয় ও উদ্যমের অপব্যয় করেন নাই, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত লোকমান্য তিলক কারারুদ্ধ থাকার ভয়ে ভীত হইয়া স্বদেশী যুগের ফেরুপালেরা আরও বন হইতে বনান্তরে আত্মগোপন করিয়া লাঙ্গুল গুটাইয়াছিল। তিলকের কারামুক্তির পর হইতে কংগ্রেসে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মহাত্মা গান্ধীও এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার শব-সাধনা শেষ করিয়া ভারতে ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসেন। তখন রাজনীতির প্রকাশ্য প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য বিধায় চিত্তরঞ্জন আসিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন—১৯১৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। এ চিত্তরঞ্জন সেই ১৯০৬ সালের চিত্তরঞ্জন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি নহে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে একের পর আর অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনকে বাঙ্গালায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালী যে মরে নাই, বাঙ্গালীর প্রাণ ধর্ম্ম যে মরে নাই—চিত্তরঞ্জন তাহার প্রমাণ। মহাত্মা গান্ধীর পরে চিত্তরঞ্জনই সত্যাগ্রহী বলিয়া নিজের নাম লিখেন। ময়মনসিংহে বক্তৃতাকালে তিনি নিজেকে সত্যাগ্রহী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হয়। খেলাফতের অবমাননা হেতু

মুসলমান সম্প্রদায়েরা পর্য্যন্ত এবার মহাত্মা গান্ধীকে নেতা করিয়া সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। হিন্দু মুসলমানের একত্রীভূত এরূপ আন্দোলন ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে আর কখনও কেহ দেখে নাই। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে ছাত্রগণ স্কুল ছাড়িয়া—উকিলগণ আদালত ছাড়িয়া আসিয়াছিল; জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সালিশী-আদালত গড়িয়া তুলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এ কার্য্যে তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ছাত্রেরা যে আবার দলে দলে সরকারী স্কুল কলেজে ফিরিয়া গিয়াছে, উকিলেরা যে আবার আদালতে সামলা মাথায় দিয়া উপস্থিত হইতেছেন, ইহার জন্য দায়ী চিত্তরঞ্জন নহেন—দায়ী ছাত্র ও উকিল সমাজ—দায়ী এদেশের স্বার্থপরতামূলক ধাতু ও প্রকৃতি। চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিল একই দিনে একই সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী অসহযোগ (Whole India Non-co-operation) ঘোষণা করা, এইজন্যই তিনি দেশকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও চিত্তরঞ্জনের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। বস্তুত বাঙ্গালী ও গুজরাটী জন-নায়কের এইরূপ অপূর্ব্ব সংযোগ ভারত পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই—ভারতে ইহা নূতন ও অভূতপূর্ব্ব।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" এই বৈষ্ণব মতের সমর্থক—বৈষ্ণব গীতি কবিতায় কারণ কোমল প্রাণ। চিত্তরঞ্জন যে কোনদিন ভৈরব মূর্ত্তিতে অন্যায়ের প্রতীকার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবেন ইহা কে আশা করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর অবশ্য ইচ্ছা ছিল যে, ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে

স্তরের উপর স্তর ভেদ করিয়া—তারপর দেশব্যাপী অসহযোগ করিবে, দেশবন্ধু কিন্তু বলিতেন, কোন বিলম্বের প্রয়োজন নাই, এমনই একদিন সমগ্র ভারতে যে যেখানে আছে সকলে অসহযোগ করিয়া সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিউন, দিলেই ভারত সরকার অচল হইবে, অচল হইলেই পার্লামেণ্ট ভারতবাসীকে স্বরাজ দান করিবে।

মহাত্মা গান্ধী নিজের আত্মবলের উপর নির্ভর করিয়া যাহা কিছু আদেশ করিতেন, কিন্তু দেশবন্ধু তাহা নহে। তিনি ভারত-বাসীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে কার্য্য করিতেন। মহাত্মা গান্ধী নিজে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ—পৃথিবীর কোন অত্যাচারই এ পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মিক বলকে প্রশমিত করিতে পারে নাই। তাঁহার পক্ষে এক বৎসরে আত্মিক স্বরাজ লাভ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু দেশবন্ধু সেরূপ বিবেচনা করিতেন না। তিনি জানিতেন পঁয়ত্রিশকোটী ভারতবাসী—মহাত্মা গান্ধী নহে, মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা পঁয়ত্রিশকোটী ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, দেশবন্ধু তাহা জানিতেন। তাই তিনি কোনওদিন এমন কথা বলেন নাই যে, দেশবাসী চরকা কাটিলেই এক বৎসরে স্বরাজ আসিবে।

গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন এই উভয় নায়কেরই এক বিষয়ে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য ছিল। এই দুই মনীষিই ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া জাতীয় মন্দিরে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন তাঁহার নিজমত যেরূপ

স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী সেরূপ করেন নাই। বাঙ্গালার প্রাণ ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সভ্যতা, বাঙ্গালীর সাহিত্য চিত্তরঞ্জনের মধ্য দিয়া যে সুরে ও যে-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, জীবনের অধিকাংশ কাল বিদেশে অবস্থান করায় মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে গুজরাটের—তথা ভারতের কোন এক বিশেষ প্রদেশের বিশেষ সভ্যতা ও সাহিত্য তেমন আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পায় নাই। সাধারণের চক্ষে এই ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী যেরূপ বিশ্বজনীন উদার জাতীয় আদর্শে ভরপূর, চিত্তরঞ্জন সেইরূপ বাঙ্গালার বিশেষ সাধনায় ভরপূর ছিলেন। বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন ভারত ভারত বলিয়া চীৎকার করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা বাঙ্গালা বলিয়া সর্ব্বাগ্রে চীৎকার করিয়াছিলেন। তাই তিনি বাঙ্গালার কথায় লিখিয়াছিলেন— 'শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতি সমূহ বিধাতার সৃষ্টি-স্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একত্ব আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না, জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই ফুটিয়া উঠে।" এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালী হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, খ্রীষ্টান হৌক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জাতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে

একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধরের রূপ বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আবার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমায় আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সেরূপের বালাই লইয়া মরি।"

১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালার মর্ম্মকথা। মর্ম্মে মর্ম্মে যিনি বাঙ্গালাকে বুঝিয়াছেন, তিনিই বাঙ্গালার বিশেষ রূপের মধ্যে বিশ্বের অনন্তরূপের আভাষ দেখিতে পান। বিশেষের মধ্য দিয়া বিশ্বকে—বিশ্বাতীতকে দর্শনের যে শক্তি তাহা চিত্তরঞ্জন দেখাইয়াছেন। নিখিল ভারতের জাতীয় মন্দিরে বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার সভ্যতাকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, মৈথিলী, অযোধ্যা, কাশী ও দাক্ষিণাত্যবাসী প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যদি ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও প্রাদেশিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করিয়া ভারতের জাতীয়-মন্দিরে মিলিত হন, তবে সে রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও একত্বের অভাব হইবে না। কেন না, বহুত্বের মধ্যে—এক আছে,—ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই স্বীকার করিবেন—আর ইহাই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের কথা, সুতরাং ভারতবাসীর জাতীয়তার আদর্শে চিত্ত-রঞ্জনের যে আদর্শ ও কল্পনা তাহা মুছিয়া ফেলিবার নহে। মহাত্মা

গান্ধীতে ও চিত্তরঞ্জনে এইখানেই পার্থক্য—এইখানেই চিত্তরঞ্জনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

চিত্তরঞ্জনের ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগের কারণ

১৮১৪ সাল নাগাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়ার দেয় চাঁদা সহ আবেদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার মালঞ্চ পুস্তক প্রকাশের জন্যই হউক বা তাঁহার নিজের বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্বের জন্যই হউক তাঁহাকে সভ্য করেন নাই। তিনি ধূমপানের সময় ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আসিয়া পড়িলে নলটী গোপন করিতেন কিন্তু ইংরাজী জ্ঞানবর্জ্জিত সেকেলে ব্রাহ্মপাদ্রীদের (প্রচারক) সামনে নল সরাইতেন না বা মাথাও অযথা নত করিতেন না, ইহাও কি তাঁহাকে সভ্য না করার অন্যতম কারণ? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, একদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও সভ্য করেন নাই!! স্পর্দ্ধা! আরও বহু স্পষ্টবাদী দেবচরিত্র ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে পারেন নাই; কারণ কি? ভয়? অথচ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়ার নিয়মাবলীর বিরোধী কার্য্য সকল করিয়া এবং হিন্দু সভার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য রহিয়াছেন কেন? তাঁহারা কোন কিছুতে থাকন না বলিয়াই কি? ব্রাহ্মসমাজকে মোহান্ত মহারাজের সম্পত্তি বলা যায় কি? এমন কি দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা

করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা করা হয় ও সেজন্য পূর্ব্বাহ্নে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ অনেকের স্বাক্ষরিত হ্যাণ্ডবিল প্রচার করা হয় এই অপরাধে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রমুখ অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ কি বলিতে চাহেন? ব্রাহ্মদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বহু ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপরাপর ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন সেটা সমাজের পক্ষে কি লাভসূচক?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে চাওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার হিন্দু মতে অসমবর্ণে বিবাহ দেন। এই বিবাহে যাহাতে কোনও ব্রাহ্ম যোগদান না করেন সেজন্য কোন কোন নন্দী ভৃঙ্গী ব্রাহ্মের সাক্ষরিত ও মুদ্রিত একখানি আবেদন ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রচার করিয়া উদার ব্রাহ্ম নামের পরিচয় দেন। ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় চৌধুরী (এক্ষণে স্বর্গীয়) মহাশয় সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে চাহেন, বলেন "তোমরা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিলে না এরূপস্থলে তিনি বাধ্য হইয়া হিন্দু-মতে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে ত তোমাদের বাধা দেওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।" এই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদও ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ফলে সে আবেদন প্রচার বন্ধ হয়। এই বিবাহে দেশবন্ধু শালগ্রাম শীলা আনয়ন করায় তাঁহার বহু আত্মীয়-স্বজনের ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয় ও ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বিবাহসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপর পুত্রকন্যা ও ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ ব্রাহ্মমতেই হইয়াছে। উক্ত

বিবাহের পরই তিনি রসিক কীর্ত্তনীয়ার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পাবনার অনুকূল ঠাকুরের মা মনোরমা দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজে ত পাড়িয়া, পঞ্চম, শূদ্র আছে কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এ সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দিবার ও অহঙ্কার করিবার আছে ?

ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলেও যে বেদান্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উপাদান সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদান্তের উচ্চভাব কিন্তু চিত্তরঞ্জনের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। বেদান্তের লক্ষ্যই হইল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" এ জগতে এক ছাড়া দুই নাই! নদীর কুলু কুলু ধ্বনিতে এক, পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে এক—পক্ষীর কূজনে এক, প্রস্ফুটিত পুষ্পে সেই এক এবং চন্দ্রসূর্য্যের কিরণেও সেই এক ছাড়া বহু নাই। এই এক হইতে বহুর উৎপত্তি। এই কারণে চিত্তরঞ্জন যদিও প্রকৃত অর্থে হিন্দু ছিলেন, তাহা হইলেও জাতিভেদের তিনি ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কায়স্থের সহিত এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রকে পশ্চিমবঙ্গের একটি ব্রাহ্মপরিবারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়াছিলেন। কেবল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশানুসারে তিনি কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ ক্রিয়া সম্পূর্ণ হিন্দুমতে সমাধা করিয়াছিলেন। শোনা যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের মত পণ্ডিতও তাঁহার কন্যার এই বিবাহ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কৌন্সিলে মিঃ প্যাটেলের বিল উপস্থিত করিবার বহুপূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন নিজ কন্যার অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন।

পণপ্রথার তীব্রতা দেখিয়া চিত্তরঞ্জন মনের ভিতর তীব্র বেদনা

অনুভব করিতেন। স্নেহলতা নাম্নী একটি হিন্দু বালিকা কেরোসিনে বসন সিক্ত করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে শুনিয়া তিনি বড় বিষাদে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "হিন্দু সমাজ হইতে কবে এই নিষ্ঠুর প্রথা দূর হইবে!" যাহারা পণ গ্রহণ করে সেই সব পাত্রের পিতার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "এই সব নিষ্ঠুর লোকেরা পণপ্রথার তীব্রতা অনুভব করিতেছেন না, কত পরিবার যে এ প্রথার ফলে ধ্বংস হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই, পাত্রের পিতারা ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। সমাজ ধ্বংস হয় হৌক—তাঁহাদের নিজেদের উদর পূর্ণ হইলেই হইল। পুত্রের পিতারা ভাবেন, পুত্রের বিবাহে পণ না লইলে তাঁহারা কিরূপে নিজেদে কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাইবেন, অতএব পুত্রের বিবাহে দস্তুর মত পণ লইবার জন্য তাঁহারা পীড়াপিড়ি করেন। তাঁহার মতে কন্যার পিতাদের কর্ত্তব্য কন্যাদিগকে উপযুক্ত রূপে উচ্চ শিক্ষাদান করিয়া ঘরে রাখা—তাহাতে দু' চারিটা কার্পেণ্টার ও নাইটেঙ্গেলের উদ্ভব হইতে পারে।"

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের এইরূপ অভিমত ছিল।

তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিছুকাল পূর্ব্বে সিটিকলেজের রামমোহন হোষ্টেলে ছেলেদের সরস্বতী পূজা কর্‌তে না দিয়ে নীতির দোহাই দিয়েছিলেন। অথচ শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ, প্রমুখ সকলে যেয়ে ১০ হাজার টাকা এনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য বৃহৎ জমিটা খরিদ করেন। তখন বহু সর্ত্তের মধ্যে প্রধান একটা সর্ত্ত ছিল যে, সমাজের ক্রীত জমির মধ্যে কোনও অংশে কেহই কোনও

কারণে মাছ মাংস ডিম রন্ধন করিতে বা আহার করিতে পারিবেন না। এই নিয়মটী এতদিন কঠোর ভাবেই পালিত হইয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি প্রধান প্রচারক মহাশয়ের কোয়ার্টারে মাছ মাংস রাঁধা হয়, দেখাদেখি চুনোপুঁটী প্রচারকরাও তাঁদের কোয়াটারে মাছ মাংস রন্ধন করিতেছেন! এবিষয়ে কমিটী কি বলেন? মানুষ কেহ নাই? প্রতিবাদ করে, সত্যাগ্রহ করে?

রাউলট কমিশন ও চিত্তরঞ্জন

ইউরোপের সহিত—জার্ম্মাণীর ভীষণ যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ভারতবাসী ইংলণ্ডের নিকট হইতে নূতন একটা কিছু অধিকার পাইবার জন্য, একটু আশার বাণী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিল; কিন্তু তৎবিপরীতে লর্ড চেম্‌স ফোর্ড ভারতবাসীকে একেবারে সামান্য অধিকার পর্য্যন্ত দিতে অস্বীকার করিলেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে লর্ড চেমস্‌ ফোর্ড জাষ্টিস্‌ রাওলাট নামক ইংলণ্ডের কিংস বেঞ্চের একজন বিচারকের সভাপতিত্বে একটি কমিশন বসাইলেন। কি করিলে ভারতের বিপ্লববাদ দমন হইতে পারে সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তদুপযোগী আইন প্রণয়নের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ভারতের নানাস্থানে কমিশনের অধিবেশন হয়, কমিশন একদেশদর্শী তদন্ত করিয়া ১৯১৮ সালের শেষভাগে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারতের সর্ব্বত্র এই রিপোর্টের প্রতিবাদ হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেই প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া রিপোর্ট প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে—ভারতীয় ব্যবস্থাপক

সভায় রিপোর্ট অনুযায়ী আইন প্রণয়নে ব্যস্ত হইলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভায় যে বিলটি পাশ করিবার জন্য উপস্থিত করিলেন; সেই বিলটির মর্ম্ম এই যে, কোন বিপ্লববাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আসামীকে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে অতি সংক্ষেপে বিচার করিতে পারিবেন। এই বিলের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ এক বাক্যে সমস্বরে প্রতিবাদ করিল, কিন্তু শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই বিলটি পাশ হইল। তখন মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ মন্ত্র ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালায় চিত্তরঞ্জন সর্ব্বপ্রথমে এই সত্যাগ্রহ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আজ এই দুর্দ্দিনে সকলে মতভেদ ভুলিয়া একত্রীভূত হউন। পাঞ্জাব এই সত্যাগ্রহে সাড়া দিয়া উঠিল। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার দমননীতি আরম্ভ করিলেন। ডাঃ কিচলু ও সত্যপাল গ্রেপ্তার হইলেন, মহাত্মা বোম্বাই হইতে পাঞ্জাবে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, মহাত্মা গ্রেপ্তার হইলেন এবং তাঁহাকে বোম্বাই পাঠান হইল। মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে সংবাদ রাষ্ট্র হয়। কলিকাতা, আমেদাবাদ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, পাঞ্জাবে সেই বিশৃঙ্খলা অধিকতর রুদ্র মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ফলে পাঞ্জাবে সামরিক আইন ঘোষণা করা হয়। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে অমৃতসরের অধিবাসিগণ জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভার আয়োজন করেন। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। জেনারেল ডায়ার সেই জনতার উপর অতর্কিত ভাবে গুলি করিবার আদেশ দেন। শূন্য হইতে এরোপ্লেন যোগে এই জনতার

উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়, লোকদিগকে বুকে হাটাইয়া বশ্যতার পরিচয় লওয়া হয়। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের এই গর্হিত কার্য্যের সমর্থন করেন।

ভারতবাসী জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ তদন্তের জন্য দাবী করে। ভারত সচিব লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর পাঞ্জাব অত্যাচারের তদন্তের ভার অর্পণ করেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি হইতে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য নেতাগণ এই দুর্ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হন। তখন চিত্তরঞ্জনেব শারীরিক স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না। কিন্তু দেশমাতৃকার আহ্বানে তিনি নিজ শরীবের কথা ভুলিয়া গিয়া কমিটিতে যোগদান করিলেন। চারিমাস কাল চিত্তরঞ্জন সেই কমিটিতে কাজ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল, তাহাতে জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। এদিকে হাণ্টার কমিটির রিপোর্টে অমৃতসরবাসীব উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া ডায়ারের দলকে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ করেন। লর্ড মহাসভা জেনারেল ডায়ারের কার্য্যে পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়া ডায়ারকে "ভারতের রক্ষাকর্ত্তা" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জেনারেল ডায়ারকে শাস্তি দেওয়া ত দূরের কথা, ভারতে ও ইংলণ্ডে যত শ্বেতজাতি ছিলেন তাঁহারা "ডায়ার ফণ্ড" স্থাপন কবিয়া জেনারেল ডায়ারের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহার পরিণামফল সকলেই অবগত আছেন।

খেলাফত সমস্যা ও চিত্তরঞ্জন

জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের সময়ে মুসলমানদিগের প্রতি একটা ঘোর অবিচার করা হয়। ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষে মিঃ লয়েড

জর্জ্জ ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিগণকে আশ্বাস দেন যে, তুরস্কের প্রতি সুবিচার করা হইবে। কিন্তু যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তুরস্কের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহাতে তুরস্কের মান-মর্য্যাদা ও গৌরব একেবারে নষ্ট হয়। মুসলমানের খেলাফতের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা হয়।

এই সময় মহাত্মা গান্ধী পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খেলাফতের প্রতি অবিচারের প্রতীকার স্বরূপ "অসহযোগই" একমাত্র নিরুপদ্রব অস্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির যে বিশেষ অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অধিকাংশ দর্শক ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবে স্থির হয় যে :—

(১) দেশে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।

(২) আদালত বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বিদেশী বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৪) স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) জাতীয় চাকুরীতে লোক বাহাল করিতে হইবে।

(৬) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কলিকাতার এই বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন—স্কুল কলেজ হইতে ছাত্রদিগকে ছাড়াইয়া লওয়া এবং আদালত পরিত্যাগ করার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু নাগপুর কংগ্রেসে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া অসহযোগ মন্ত্রে এরূপভাবে শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন যে, তিনি নিজেই সেই কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

তিনি নিজে যাহা বলিতেন কার্য্যেও তাহাই করিতেন। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিলেন।

এই দুই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন যখন ডুমরাঁওন রাজার মোকদ্দমায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি বেশীদিন এই পার্থিব জগতের সুখৈশ্বর্য্য লইয়া থাকিতে পারিবে না; তোমাকে শীঘ্রই এই ভোগসুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে।" তখন সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথায় কেহই আস্থা স্থাপন করেন নাই। সময় যে এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

লোকমান্য তিলকও চিত্তরঞ্জনের স্বার্থত্যাগের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস, সময় অধিক দূরে নয়, যখন চিত্তরঞ্জন তাঁহার সমস্ত শক্তি ও অধ্যবসায় দেশের সেবার জন্য নিয়োজিত করিলেন, তখন তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি আলোক বর্ত্তিকা স্বরূপ দেশবাসীকে দেশ-সেবার পথ দেখাইয়া দিবে।"

চিত্তরঞ্জনের আত্মীয়-প্রীতি

চিত্তরঞ্জন আপন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে কিরূপ ভালবাসিতেন, সে সম্বন্ধে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পূজার বন্ধের পূর্ব্বেই Congress of Universities of the British Empire এর কাজ শেষ করিয়া আমি বিলাত হইতে দেশে ফিরিতে বাধ্য হই। বন্ধের পূর্ব্বেই ফিরিতে হয়। সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে যে ডাক জাহাজ যাইতেছে, তাহার মধ্যে একটাকে "Judges' boat" বলা হয়। এ অদ্ভুত আখ্যার

অর্থ এই যে, পূজার বন্ধে ভারতবর্ষের জজেরা যে জাহাজে বিলাত গমন করেন বা বন্ধের পর যে জাহাজে ফিরিয়া আসেন, তাহাকেই হাইকোর্টের কথায় Judges' boat বলে। সে বৎসর চিত্তরঞ্জন Judges' boat এ বিলাত যাইতেছেন, আর আমাদের জাহাজে আছেন তাঁহার ভ্রাতৃজায়া পাটনা হাইকোর্টের জজ মিঃ পি আর দাসের স্ত্রী। ভুবনমোহন বাবুর সঙ্গে আমার যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পুত্রবধূর কথা বলিতেন। কাজেই জাহাজে একত্র আসিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। এক টেবিলেই পাশাপাশি আমাদের খাওয়া দাওয়া ও কথাবার্ত্তা হইত। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা। বিলাত হইতে ফিরিতেছেন। কোন কোন "সাহেবী" ধরণের বাঙ্গালী মহিলা তখন ইংলণ্ডে প্রসূত সন্তানের জননী হইবার আশায় অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বিলাতে যাইতেন। কিন্তু খাস বিলাতী মেম মিসেস পি আর দাশ প্রসব হইবার জন্য স্বামীর জন্মভূমিতে ব্যগ্র হইয়া ফিরিতেছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহার মধুর স্বভাবে জাহাজ শুদ্ধ লোক সুখী হইয়াছিল। তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ইচ্ছা করিয়া স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ীর বিপরীত অনুরোধ সত্ত্বেও খাঁটি বাঙ্গালী মহিলার জীবন যাপন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করেন, তাহার পরিচয় দিতেন। স্যার রাজেন্দ্র ও লেডী মুখোপাধ্যায়ও সেই জাহাজে ভারতবর্ষে ফিরিতেছিলেন। মিসেস্ দাসের সে অবস্থায় যেরূপ যত্ন সেবার প্রয়োজন, লেডী ডাক্তার সেই ভাবের যত্ন সেবা করিতেন। বোম্বাইয়ে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জাহাজেই তিনি সন্তান প্রসব করেন।

একদিন Judges' boat আমাদের জাহাজের নিকট দিয়া যাইতেছিল;

আমরা অপর জাহাজ হইতে একটি বিলাতের টেলিগ্রাম পাইলাম। যাহাকে Sea-law বলে, তখন দুই জাহাজ তাহারই মধ্য দিয়া দিয়া যাইতেছিল। সমুদ্রের সকল জায়গা দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করা নিরাপদ নহে। সেই জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পথে বিপরীত-গামী জাহাজকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সেই জাহাজে চিত্তরঞ্জন ইংলণ্ড যাইতেছিলেন। ভ্রাতৃবধূর তদানীন্তন অবস্থায় চিত্তরঞ্জন বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন। তাই জাহাজ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বেতার বার্ত্তায় ভ্রাতৃবধূর সংবাদ লইলেন। মিসেস্ দাশ তখন প্রসব হইয়া সুস্থ হইয়াছেন, বেতারে এই বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরিল না। পুনরায় বেতার বার্ত্তা দ্বারা তিনি উল্লাস প্রকাশ করিলেন। ব্যাপারটি অতি সামান্য হইলেও এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের এতাদৃশ আত্মীয় প্রীতির পরিচয় পাইয়া জাহাজস্থ সকলে—বিশেষতঃ ইংরাজ মহিলাগণ বিশেষ প্রীতা হইলেন।

ব্যবস্থাপক সভা ও চিত্তরঞ্জন

কারামুক্ত হইয়া চিত্তরঞ্জন পুনর্ব্বার গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার কারারুদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সমিতিতে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন সেই অধিবেশনে আপন অভিভাষণ পাঠকালে প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীকে যীশু খ্রীষ্টের সহিত তুলনা

করেন। তারপর ইংলণ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া তিনি প্রজার স্বাভাবিক অধিকারের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া দেশবাসীকে জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি বলেন, স্বরাজ বলিলে কোন বিশেষ শাসনপদ্ধতি বুঝায় না, তাহা জাতির হৃদয়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। হিংসার দ্বারা স্বরাজলাভ করা যায় না। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, ইটালীতে ও রুসিয়ায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই কংগ্রেসে তিনি এ দেশের শাসনপ্রণালীর একটি চিত্র প্রদান করেন; তিনি বলেন (১) সেকালের গ্রাম্য সমিতির আদর্শে বা অনুকরণে স্থানীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে (২) এই সব প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্বশাসনশীল হইবে (৩) কেন্দ্রিক সরকারের কার্য্য প্রধানতঃ পরামর্শ দানে পর্য্যবেসিত হইবে। (৪) বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাসমূহ ভারতের উপযোগী নহে, ইহাদিগকে সংস্কৃত করিতে হইবে, নতুবা নষ্ট করিতে হইবে। ইহা ব্যুরোক্রেশীর ছদ্মবেশ—সেই ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া ইহার স্বরূপ দেখাইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে সে কায করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগের মূলনীতি পরিত্যাগ করা হয় না। ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা আমলা-তন্ত্রের শক্তি ক্ষয় না হইয়া বরং শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। করের মাত্রা কেবলই বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের লোক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যাহাতে এই সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা ব্যুরোক্রেশীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে না পারে তাহাই করুন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের এই প্রস্তাব তখন কেহ গ্রহণ করিল না, চারিদিক হইতে তুমুল বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হইল।

শ্রীযুত এস্ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার একটি সংশোধক প্রস্তাব করিলেন, "যেহেতু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে অধিকাংশ ভোটার নির্ব্বাচন বন্ধ করিলেও বহু ভারতীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং নাগপুরে কংগ্রেস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও পদত্যাগ করেন নাই, ফলে নূতন ব্যবস্থাপক সভা সমূহ লোকমতের প্রতিনিধি না হইলেও সরকার সেগুলির দ্বারা আপনার শক্তি দৃঢ় করিয়া লইতেছেন, সেই জন্য এই কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন অধিকতর ফলোপধায়ী করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, ভোটাররা কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকেই ভোট দিবেন এবং সেই সকল কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবেন না।" এই প্রস্তাব ও সংশোধক প্রস্তাব লইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী তর্ক বিতর্ক হয়। শেষে ১৭৫০জন প্রতিনিধি আয়েঙ্গার মহাশয়ের সংশোধক প্রস্তাবের বিপক্ষে ও ৮৯০ জন পক্ষে ভোট দেওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হয়।

গয়ার এই অধিবেশনে পরাভূত হইয়া চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের মধ্যেই নূতন দল গঠন করিলেন। তিনি নূতন দল গঠিত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন না।

স্বরাজ্যদলের চরম উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ। এই স্বরাজ লাভের জন্য অতঃপর স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-কারীদিগকে কংগ্রেসের পদপ্রার্থী দিগকে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কথা হইল স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের প্রস্তাবে বাধা

দান করিবেন এবং সরকারের অধীনে কোন চাকুরী স্বীকার করিবেন না।

স্বরাজ্যদলের এইরূপ কার্য্যে দেশের মধ্যে ভয়ানক মনো-মালিন্য ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য দিল্লীতে কংগ্রেসের একটি অতিরিক্ত অধিবেশন হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন! সেই অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি একটী মিটমাটের প্রস্তাব করিয়া বলেন যে,—

(১) কংগ্রেস যে অহিংস অসহযোগ নীতিতে অবিচলিত, সেই কথা পুনরায় বলিয়া এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মীরা ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশে ধর্ম্মগত বা বিবেকগত বাধা নাই, তাঁহারা আগামী সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা সদস্য প্রার্থী হইতে পারেন। সুতরাং কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থগিত রাখিতেছেন।

(২) কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে এই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দিষ্ট গঠন মূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্যও অনুরোধ করিতেছেন।

সেই প্রস্তাবের উত্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেন, ব্যবস্থাপক সভা-প্রবেশে যাঁহাদের ধর্ম্ম বা বিবেকগত বাধা আছে, তাঁহারা তথায় যাইবেন না। কংগ্রেসে দ্বিবিধ মতাবলম্বী আছেন বলিয়া আমরা কি কংগ্রেসকে বিভক্ত করিব? মুসলমানরা কি হিন্দুদিগকে বলিবেন—তোমরা যখন কোরাণ মান না, তখন হয় তোমরা কংগ্রেস ত্যাগ কর, নহেত আমরা যাই? প্রস্তাবে গঠনকার্য্যের কথা বলা

হইয়াছে, কেহ কেহ মনে করেন, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা গঠন কার্য্যে মনোযোগ দিতে চাহেন না। একথা ভিত্তিহীন। পরন্তু গঠন কার্য্যের পথে যে সব বিঘ্ন রহিয়াছে, ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া সেই সকল দূর করিবার চেষ্টা করা হইবে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই প্রস্তাবটীর সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

দিল্লীতে এই জয়ের পর চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে আর কখনও পরাজিত হন নাই। এই অধিবেশনের পর হইতে তিনি নিজের দলগঠনে যে প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিত্তরঞ্জনেই সম্ভব।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কোকনদে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনেও দিল্লীর প্রস্তাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

কংগ্রেস কর্ম্মীসঙ্ঘের সম্পাদকের

ইস্তাহার

বর্ত্তমানে কংগ্রেস যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে একটী বিবরণ

কংগ্রেসকর্ম্মীসঙ্ঘের অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সরকারের সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত ইস্তাহার পাঠে জানা যায়ঃ—আমরা দেখিতে পাইতেছি

যে, কংগ্রেসের কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতা জনসাধারণের চক্ষে কর্ম্মীসঙ্ঘকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য রীতিমত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কংগ্রেসকর্ম্মীসঙ্ঘকে 'কংগ্রেসের বিরোধী' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন; কিন্তু কর্ম্মীসঙ্ঘ যে কংগ্রেসের বিবোধী তাহা তিনি প্রমাণ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী ও তাঁহার বন্ধুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন, কর্ম্মীসঙ্ঘের দুই একজন সভ্য দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইতেছেন বলিয়া 'অবিশ্বাসী'। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কর্ম্মীসঙ্ঘের মধ্যে বিদ্রোহের গন্ধ পাইয়াছেন, আর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কর্ম্মীসঙ্ঘের শতকরা ৫০ জন সভ্য গোয়েন্দা।

কংগ্রেস নেতৃগণের উপরোক্ত প্রকার মতামত প্রকাশের পর আমরা মনে করি আমাদের পক্ষের বক্তব্য জনসাধারণকে জানান সমীচীন।

কর্ম্মীসঙ্ঘের উদ্দেশ্য

কংগ্রেসের যে গঠনমূলক কার্য্যের দিকে বর্ত্তমান নেতাদের ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে, সেই গঠনমূলক কাজ করিবার জন্য এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীস্থাপনের জন্য এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি চালাইবার জন্য সারা বৎসর কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী কাজ চালাইবার জন্য এই কর্ম্মীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে নির্ব্বাচন শেষ হইলেই যে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য শেষ হইল, কর্ম্মীসঙ্ঘ এরূপ মনে করেন না। নেতারা যে গঠন-

মূলক কার্য্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছেন, সেই গঠনমূলক কার্য্যের জন্য অগ্রসর হওয়াই কংগ্রেস কর্ম্মীদের উদ্দেশ্য। যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ প্রসারিত হইতে পারে, এমন কোন ব্যাপারে এই কর্ম্মীসঙ্ঘ জড়িত থাকিবেন না।

নেতাদের ভ্রম

যাঁহাকে নেতারা প্রকাশ্য কর্ম্মময় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্র হইতে সরাইতে চাহেন তাঁহাকে "গোয়েন্দা" আখ্যায় আখ্যায়িত করা অধুনা নেতাদের অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা যে গোয়েন্দা, ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ তাঁহারা উপস্থিত করিতে পারেন না। যাঁহারা লোককে দোষী বিবেচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিতে না হওয়ায় অন্যকে দোষী বলা বিশেষ সহজ কাজ; কিন্তু যাঁহাকে দোষী বলা হয়, তাঁহার পক্ষে নিজেকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

শ্রীমতী নাইডুর আত্মবিস্মৃতি

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যখন কংগ্রেসকর্ম্মীসঙ্ঘের সভ্যদের বহু সংখ্যকের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার আত্মপদ-মর্য্যাদা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। তিনি সে কথা আদৌ ভাবেন নাই যে, কংগ্রেসের দলভুক্তদের ও স্বরাজ্যদলের এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা কর্ম্মীসঙ্ঘের সভ্যদের চেষ্টাতেই হইয়াছে।

শাসমলের অভিমান

কংগ্রেসের সভ্যগণ যখন কলিকাতা কর্পোরেশন দখল করেন, তখন কাহাকে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার করা যায়, এই প্রশ্ন সকলেরই মনে উঠে। তখন বর্ত্তমান কর্ম্মীসঙ্ঘের কয়েকজন সভ্য এবং তাঁহাদের বর্ত্তমানে অন্তরীণে আবদ্ধ বন্ধুগণ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকেই চীফ একজিকিউটিভ অফিসারপদে নিযুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন এবং তিনিও এই মোটা বেতনের লোভনীয় পদটী লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় শাসমল মহাশয় মনে করিলেন, তিনি এতদিন যে দেশের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, দেশের লোক তাহার সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। অভিমানে অতঃপর স্বার্থত্যাগী শাসমল মহাশয় স্বরাজ্যদলের সহিত সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন,—এমন কি, দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলেন।

দেশবন্ধুর অবমাননা

দেশবন্ধু তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মিষ্টার শাসমল সাহেবের "গোঁসা" কিছুতেই যায় না। অতঃপর শাসমল মহাশয়ের মাথায় হঠাৎ এই বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল যে, কর্ম্মীদের প্রতিবাদের জন্যই তিনি এই ঈপ্সিত পদটি লাভ করিতে পারেন নাই। তদবধি শাসমল মহাশয় কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মনে মনে তীব্র বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কৃষ্ণনগরে

কর্ম্মীদিগের উপর বিদ্বেষবিষ বর্ষণ করিয়া তিনি ঘাড়ের বোঝা নামাইলেন। এস্থলে এ কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন আমলাতন্ত্র অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কারণে কর্ম্মস্থল হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তখন দেশবন্ধু শ্রীযুত শাসমলকে সেই শূন্যপদে বসাইবার জন্য বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ও অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। কি কারণে যে করেন নাই, তাহা আমরাও জানি, দেশবন্ধুও জানিতেন!

মেয়র নির্ব্বাচনের গোলযোগ

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনে বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের মধ্যে বিশেষ মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট লোক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হয় শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রকে—না হয় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে মেয়র নির্ব্বাচিত করা হউক। অন্যান্য লোকে মনে করেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ও বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র একই ব্যক্তি হইবেন। মহাত্মা গান্ধী তখন কলিকাতায় ছিলেন, তিনিও এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তখন সেনগুপ্ত মহাশয় আজ যাহাদিগকে বিদ্রোহী ও শ্রীমতী নাইডু গোয়েন্দা বলিতেছেন, তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়েন। বর্ত্তমান কর্ম্মীদের চেষ্টাতেই তখন তিনি মেয়র হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে কাহারও কাহারও অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী এই সময় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া

সেনগুপ্তের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সঙ্গে যোগ দেন। কাজেই আজ যাঁহারা কর্ম্মীসঙ্ঘের সভ্য, তাঁহারা কলিকাতার কতকগুলি ধনী প্রতিপত্তিশালী লোকের চক্ষু:শূল হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুত শাসমল আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন এবং শ্রীযুত সেনগুপ্তের অনুকূলে যাঁহারা কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার জনরব প্রচারিত হয়।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর শ্রীযুত শাসমল আবার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। এমন কি, তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিপদের জন্য পর্য্যন্ত প্রার্থী হয়েন। কিন্তু শাসমল মহাশয়কে পরিশেষে নিরাশ হইতে হয়।

১৯২৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সভায় শ্রীমতী বাসন্তী দেবী কমিটীর সভানেত্রী হইতে অস্বীকার করায় শ্রীযুত সেনগুপ্ত এই কর্ম্মীদের চেষ্টাতেই নির্ব্বাচিত হয়েন। কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্সে শাসমল মহাশয় কর্ম্মীসঙ্ঘের উপর কিরূপ বিদ্বেষবাণ বর্ষণ করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গত ১৩ই জুন ১৯২৬ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যে সভা হয়, সেই সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বন্ধ করিয়া নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিবার জন্য মিষ্টার সেনগুপ্ত আবেদন করেন। কেন না, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিকাংশ সভ্য কর্ম্মীসঙ্ঘভুক্ত এবং তাঁহারা স্বরাজ্যদলের "প্যাক্টকে" সমর্থন করেন না। কাজেই মিষ্টার সেনগুপ্তের মতে ইহারা কংগ্রেসের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তিনি আবেদন করেন, অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এমন সমস্ত লোককে সদস্য করা হউক, যাহারা অন্ধের

ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিবে! সেনগুপ্ত এই কৌশলে জয়লাভ করেন।

কাজেই কর্ম্মীসঙ্ঘকে বাধ্য হইয়া নেতাদের এইরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে এবং প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নেতাদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মীসঙ্ঘ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কর্ম্মীসঙ্ঘ কংগ্রেস কমিটীসমূহের পুনঃসংস্কার ও গ্রাম্য সংগঠনকল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন। কর্ম্মীসঙ্ঘ আশা করেন যে, দেশবাসী তাঁহাদের এই সৎকার্য্যে সাহায্য ও সহযোগীতা করিবেন। ১২।৮।২৬

হিন্দু মুসলমান চুক্তি

দেশবন্ধু কোকনদ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাব সংস্থাপনের জন্য মুসলমানদের সহিত একটি চুক্তি (Pact) করিলেন। সেই চুক্তি দ্বারা স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত হইলে বাঙ্গালায় হিন্দুমুসলমানে অধিকার কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করেন। চুক্তিতে ঠিক হয়:—

(১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির :হইবে এবং স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক

নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচন হইবে। নিখিল ভারত হিন্দু-মুসলমানে চুক্তি এবং কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির নির্দ্ধারণে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে সদস্য নির্ব্বাচনে জেলায় যে সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য, সেই সম্প্রদায় হইতে ৬০ জন ও অপর সম্প্রদায় হইতে ৪০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৩) সরকারী চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমানরা পাইবেন। তাহার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ হইবে—যতদিন পর্য্যন্ত চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত না হয়, ততদিন যোগ্যতায় সর্ব্বনিম্ন আদর্শানুরূপ হইলেই মুসলমানেরা চাকরী পাইবেন এবং ততদিন হিন্দুরা শতকরা ২০টি চাকরী পাইবেন।

(৪) যে সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব বা আইন উঠিবে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদিগের শতকরা ৭৫জন নির্ব্বাচিত সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সেরূপ প্রস্তাব বা আইন গৃহীত হইতে পারিবে না!

(৫) মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য হইবে না।

(৬) ধর্ম্মগত ব্যাপারে গো-বধে আপত্তি করা হইবে না।

(৭) ব্যবস্থাপক সভায় গো-বধ বিষয়ে কোন আইন করা হইবে না। তবে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে উভয় সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা করা হইবে।

(৮) গোহত্যা এমন ভাবে সংসাধিত হইবে যে, তাহাতে যেন হিন্দুদের ব্যথা না লাগে।

(৮) হিন্দুমুসলমানে বিরোধ ঘটিলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত হইবে। তাহার সদস্য অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক মুসলমান হইবেন—সমিতি আপনার সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গভর্ণমেণ্টকে অচল করিবার এবং সাওয়ার্জি রহিমীদলকে হস্তে রাখিবার জন্যই যেন এই চুক্তি করিয়া এই অদ্ভুত ও সর্ব্বনাশকর রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন! এবং তাঁহার প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের দ্বারায় কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা বোধকরি তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই হিন্দু মুসলমান প্যাক্টের জন্য ভবিষ্যতে দেশ কি ভীষণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইবে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া সারা ভারতবর্ষে আরম্ভ হইবে! মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই প্যাক্টের বিরুদ্ধে ভারতসভাগৃহে একটি সভা হয়, সে সভায় নাকি দেশবন্ধু দাশের শিষ্যবর্গ অনেক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহারাজা দারভাঙ্গার সহায়তায় এলবার্ট ইন্সটিটিউটে আর একটি প্যাক্ট বিরোধী সভা হয়।

১। বর্ত্তমান সেনসাস রিপোর্টে (আদমসুমারীতে) দেখা যায়, শিশু মুসলমানরাই সংখ্যায় অধিক। ১৫।২০ হইতে উর্দ্ধ বয়স্ক হিন্দুরাই সংখ্যায় অধিক।

২। শিক্ষায় মুসলমানরা ও মুসলমান মহিলারা এত পশ্চাতে যে, আমাদের এজন্য অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে হয়!

৩। ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, কারখানার

অধিকারী, বৈজ্ঞানিক ও জমিদার প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তিধারী মুসলমান-সমাজে নাই বলিলেই চলে।

৪। যত রকম গুরু পাপকার্য্য ও দুর্নীতি আছে তাহার অপরাধে মুসলমানেরা শতকরা ৬৩ (তেষট্টি) জন আর হিন্দু খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, জৈন, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সমস্ত জাতি একত্র করিয়া শতকরা ৩৭. জন! কি শোচনীয় লোমাঞ্চকর ভীষণ পরিণাম! আর ইহাতেই জানা যায়, মুসলমান সমাজে আইন ভঙ্গকারীর সংখ্যা কত অধিক! এরূপস্থলে মুসলমানেরা চাকুরীতে, আইন-মজলিসে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কি করিয়া শতকরা ৫৫ হইতে ৮০ জনের অধিকার দাবী করিতে পারেন? আর তাহাতে ত সত্যকারেরই গভর্ণমেণ্টের কার্য্য অচল বা অযোগ্য হইয়া পড়িবে। আর ইহাও মুসলমান সমাজের জানা প্রয়োজন যে, হিন্দুরাই ট্যাক্স, আয়কর প্রভৃতি প্রায় সমস্ত অংশই দিয়া থাকেন আর দেশের মঙ্গলকর সমস্ত অনুষ্ঠানে যথা:—হাঁসপাতাল, স্কুল, কলেজ, পথঘাট, সেবাসমিতি প্রভৃতি হিন্দুদের টাকায় হিন্দুর দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত, এ সমস্ত অনুষ্ঠানে হিন্দুদের কোটি কোটি টাকা দান আছে। অথচ তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ মুসলমানরাও করিয়া থাকেন। অথচ মুসলমানরা এসকল কার্য্যে কতটাকা ব্যয় করিয়াছেন? হিন্দুর বিপুল ঐশ্বর্য্য চাকুরীর দ্বারায় হয় নাই। আর চাকুরীতে বর্ত্তমানে দারিদ্র্যতাই বৃদ্ধি পায় তার দৃষ্টান্ত মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের ভীষণ দারিদ্র্যতা। তারপরে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো বন্ধ করার চেষ্টাকে একটা অন্যায় জেদ করা ছাড়া আর কিছু বলা যায় কিনা জানি না। অবশ্য মসজিদের সামনে

বাজ্না বাজাইলে মুসলমান ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, কিম্বা বাজনা না বাজাইলে হিন্দুধর্ম্ম পচিয়া যাইবে ইহার কোনটাই আমরা মনে করি না। আমরা বাজনা বাজানো বন্ধ করিবার চেষ্টাকে একটা অন্যায় জেদ ও রাজনীতিক কাজ হাঁসিল করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু মনে করি না।

মস্‌জিদের সাম্‌নে বাজনা বাজানো উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত কতকগুলি মামলা দায়ের হইয়াছে? পাবনার লুণ্ঠন মামলার সাক্ষ্যদান কালে এবং ঢাকার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তথাকার মুসলমান পুলিশ সাহেব (Supdt. of Police) এবং ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মুসলমান প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় মসলেমলীগ, মৌলানা মোহাম্মদ আলি ও সৌকত আলি প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন, "মসজিদের সামনে বরাবরই বাজনা বাজিয়া থাকে।"

এদেশে মসজিদের সাম্‌নে বাজনা বাজানো বন্ধ করা অসম্ভব এই কারণে যে, আমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব, পাশেই মসজিদ এরূপ স্থলে মুসলমানের আজান ও উপাসনার জন্য আমার বাড়ীর দুর্গোৎসব কি বন্ধ করিতে হইবে? অথচ সচরাচর দেখা যায় যে, বহু মুসলমান পথে ঘাটে, মাঠে, হাটে, গাড়ীর উপর, পথের ধারে উপাসনা করেন তাহাতে কি উপাসনার বিঘ্ন হয় না? সম্প্রতি মিঃ দাউদ শ্রমিক সম্মিলনীতে প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন, সেখানকার সমস্ত প্রতিনিধিরাই বলিয়াছেন যে, রাজনীতিকে ধর্ম্মের উপরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। সভ্য জগতের ও তুরস্ক পারস্য প্রভৃতি দেশেরও তাহাই মত এবং কার্য্যেও তাঁহারা তাহাই করিয়া থাকেন।

নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া কলেজে হিন্দু অধ্যাপক নেওয়া হয় নাই। দুই একজন যাহা অস্থায়ীভাবে নেওয়া হইয়াছে তাহাও মুসলমান অধ্যাপক পাওয়া গেলে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্য অধ্যাপকের কত দরকার, অন্যথায় ছেলেদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিবে। মিঃ গজনবী, স্যার আব্দর রহিম মিঃ ফজলল হক প্রভৃতি সকলেই হিন্দু অধ্যাপকের ছাত্র।

আমাদের মনে হয়, মুসলমান সমাজের পক্ষে ইহা কর্ত্তব্য নহে যে, কে কোথায় মিছিল করিয়া গেল কিম্বা বাদ্যধ্বনি করিল। তাঁহাদের উচিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া মুসলমান সমাজকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা আর হিন্দুদেরও মহান কর্ত্তব্য একার্য্যে মুসলমানদের প্রাণপণে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা। এজন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। হিন্দুদের প্রত্যেক ব্যবসাক্ষেত্রেও মুসলমানদের গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ী করিয়া তোলা প্রয়োজন। মুসলমান সমাজকে সুশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ী করিয়া তুলিতে না পারিলে এ দেশের রাজনীতিক উন্নতি সুদূরপরাহত। আর হিন্দু মসলেম প্যাক্টকে অস্বীকার করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র গ্রহণ করা।

স্বাস্থ্যভঙ্গে পাটনা গমন

দেশের কাজের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যেরূপ অক্লান্ত ও প্রাণ দিয়া আন্তরিক পরিশ্রম করিয়াছেন এ যাবৎ দেশের জন্য সেরূপ পরিশ্রম আর কেহ কখনও করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে বড়বাজার কেন্দ্রে প্রবল পরাক্রান্ত মিঃ এস, আর, দাসের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি পতি রায়কে দণ্ডায়মান করা, বারাকপুর নির্ব্বাচনে মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে খাড়া করা হইতে চাঁদপুর কুলি হাঙ্গামা, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, হাওড়ার নির্ব্বাচন, কলিকাতা ভবানীপুর প্রভৃতি নির্ব্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন যুবরাজের উৎসব বয়কট, বিবিধ সম্মিলনীতে যোগ দান, তিলকফণ্ডে অর্থ সংগ্রহ, স্বরাজ সপ্তাহ, প্রাদেশিক ও সাহিত্য সম্মিলনীতে বক্তৃতাদান হইতে ব্যবস্থাপক সভার দোয়ার্কী ধ্বংস করণ, কর্পোরেশনের কার্য্য, আইন ভঙ্গ ও জেল গমন প্রভৃতিতে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইয়া যায়। মানুষ যে এত কার্য্য করিতে পারে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ কাশ্মীর ও পাটনা গমন করেন। কিন্তু স্বরাজ তাঁহার প্রাণ, স্বরাজ তাঁহার স্বপ্ন; তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ আর কতদিন বিদেশে থাকিতে পারেন? অগত্যা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন। এই ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় লর্ড

লিটনের খামখেয়ালীতে রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ও নবাব নবারআলী চৌধুরী মন্ত্রীর আসনে সমাসীন। এবারকার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে—মন্ত্রীবেতন নাকচ করিতে তাঁহাকে একখানি ষ্টেচারে করিয়া কয়েকজন সভ্যের দ্বারায় বহন করিয়া সভায় আনয়ন করা হয়। এবারও ভোটে মন্ত্রী বেতন নাকচ করা হয়। ইহাই তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার শেষ বক্তৃতা দান। এবারকার সভার বিশেষত্ব এই যে, এবার মিঃ ফজলল হক, মিঃ আব্দুল জব্বর পালোয়ান প্রভৃতি দেশবন্ধু বিরোধীদলও মন্ত্রী বেতন নাকচ করিতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ

(ফরিদপুর)

যুগে যুগে ভারতবর্ষ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "মুক্তি কোন্ পথে ?" ইহাই ভারতবর্ষের আত্মপ্রশ্ন। বেদের অতি প্রাচীনতম মন্ত্রে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য—মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড় বড় সাম্রাজ্য—কত বড় বড় রাজপ্রতাপ

আমাদের জাতির ইতিহাস পথে গড়িয়া উঠিয়াছে—আবার কালক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ—গতিমুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস—তাহাও এক প্রচণ্ড গতি-পথে—যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তি-পথে পুনঃ পুনঃ অতি দুর্দ্দম গতি-বেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে। শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।

যুগের অবসানে অথবা যুগের প্রারম্ভে—ভারতবর্ষ আবার আজ সেই সনাতন প্রাচীন প্রশ্নই—নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মুক্তি কোন্ পথে?" এই প্রশ্নের সমাধানে আবার কোন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবে,—এবং কোন সাম্রাজ্যই বা ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তাহা ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। আমরা জানি না। নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ভাঙ্গা-গড়া লইয়াই যদি ইতিহাস হয় এবং ভবিষ্যৎ ভারতের যদি ইতিহাস থাকে—তবে কোন কিছু ভাঙ্গিবেই, এবং কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিবেই ইহা নিশ্চিত। ইহা সৃষ্টির নিয়ম। ভারতবর্ষ সৃষ্টির বাহিরে নয়। অনিয়মে ভারতবর্ষ চলিবে না।

আলোক ও অন্ধকারে মেশামেশি,—প্রাচীন ভারতের যে অতীত অস্পষ্ট যুগ—তাহার মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে সে সুস্পষ্ট বাণী—যুগের পর যুগে যে বাণী রূপ গ্রহণ করিয়াছে,—রূপ হইতে রূপান্তরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—সেইরূপ সেই বিগ্রহ,—সেই স্বর—সেই আরাব মুক্তির—বন্ধনের নহে। ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড় জগতের পরিবর্ত্তনশীল মায়াপ্রপঞ্চ—প্রকৃতির দাসত্ব হইতে

জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু আলো ও আঁধারের মত যেখানে আসিতেছে—যাইতেছে; যাহা নশ্বর, যাহা দুদিনের, তাহাকে চিরদিনের বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে ভারতবর্ষ কোন দিন পরামর্শ দেয় নাই। যাহা দেখায় সত্য—অথচ মিথ্যা, তাহাকে ভারতবর্ষ মিথ্যা বলিয়াই জানিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে আত্মার মুক্তির পথ যে দুর্গম—ক্ষুরধার শাণিত—তাহা জানিয়াও মুক্তিকামী ভারত সেই কণ্টকময় সঙ্কট-পথে বীরদম্ভে চলিয়া গিয়াছে। ভয় পায় নাই—থামে নাই—পশ্চাতে তাকায় নাই।

আজ আবার বর্ত্তমান ভারত মর্ম্মে মর্ম্মে নিপীড়িত হইয়া তাহার সমষ্টিভূত জাতীয় চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় আত্মপ্রশ্ন করিতেছে "মুক্তি কোন্ পথে?" ইহা প্রাচীন ভারতের ব্যষ্টি-মুক্তি নয়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের সমষ্টি-মুক্তি। হে ভারতের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ—হে বাঙ্গালী, আমি আপনাদের সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ আপনাদের সম্মুখে ভারতের সেই সনাতন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি—এ সঙ্কটে এ দুর্দ্দিনে "মুক্তি কোন্ পথে?" আমি অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম। কেননা অতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে আমাদের জানিতে হইবে যে কি আমরা চাই—এবং তাহা পাইবার জন্য কি আমাদের করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে আত্মার মুক্তি চাহিয়াছে, বর্ত্তমান ভারতে সমগ্র ভারতের নরনারী—সমষ্টিভাবে সেইরূপ জাতীয় মুক্তি চাহিতেছে। ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, মুক্তির প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে, কি হইতে

মুক্তি? সকলেই বলে যে দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই—পাপ হইতেও মুক্তি। কে এই পাপ করে? আমি বলি, যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয় সেই পাপ করে। আমি আরো বলি, যে ক্লীব, ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সেও পাপ করে। বিশ্বকবি যথার্থই বলিয়াছেন যে—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড যেন তারে বজ্র সম দহে।"

চিন্তার ধারায়, বিকাশের পথে একের পর আর অথবা যুগপৎ—জাতীয় মুক্তি-প্রসঙ্গে অনেক রকম আদর্শ আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। Self-Government—Home-Rule—Indepen dence এবং Swaraj ইহা এক একটি কথা মাত্র। ইহার কোন কথাটি কি বুঝায় তাহা না বুঝিতে পারিলে এবং বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিলে যেমন সর্ব্বত্র তেমনি—আমি মনে করি, বিশেষ ভাবে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে, নিরর্থক কথা নিতান্তই ব্যর্থ। আর যদি এই সমস্ত অল্পাধিক সমতুল্য,—অথচ বিশ্লেষণ-মুখে বৈচিত্র্য-বহুল আদর্শগুলির গূঢ় ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝা যায় তবে ঐ আদর্শ জাতীয় জীবনে আয়ত্ত করিতে হইলে কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—তাহা খুব বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দুই শ্রেণীর মত এবং ঐ ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তি আছেন—আমি জানি। এক শ্রেণী বলেন—বৈধ এবং নিতান্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় মুক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অধ্য-

বসায় করা হউক। আর এক শ্রেণী বলেন যে—বৈধই হউক আর অবৈধই হউক—বল প্রকাশ ব্যতিরেকে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। অন্যান্য দু' এক শ্রেণীর মতবাদও যে দেখা না দিয়াছে তাহা নয়। তবে তাহা এতদূর স্পষ্ট নয় যে উল্লেখ করিতে পারি। এবং উল্লেখ করিলেও আশঙ্কা আছে যে উহা আমার বা আপনাদের বোধগম্য হইবে না।

জাতীয় মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে এবং তাহা আয়ত্ত করিবার উপায় সম্বন্ধে আমি আমার যা অভিমত তাহা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিতেছি। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা কল্পে আমার অভিমত আপনাদের বিচার্য্য হইতে পারে—আশা করি। আমার অভিপ্রায় এই যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন মুক্তকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুক—যে আমাদের জাতীয় মুক্তির আদর্শ কি? এবং ঐ আদর্শ আয়ত্ত করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?

মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয় স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা Iudependence এর আদর্শ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে Independence অর্থ dependence বা অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক। কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্মক (Positive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে Independence র স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য বিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ Independent অর্থাৎ অধীনতা

পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি যে কোন উপায়েই হউক—ইংরেজরাজ এ দেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ চলিয়া গেলে আমরা অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংরেজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার। স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজ লাভ এক বস্তু নহে। স্বরাজ লাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। কি বস্তুর এই উদ্ভব? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন—এবং সত্যই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে আমি আমার গয়া কংগ্রেসের অভিভাষণের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে পারি। আমি ঐ অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষে একটা জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বড় বিস্ময়কর ঘটনা। কেননা এখানে কালক্রমে একের পর আর কবির ভাষায়—"শক হুন দল—পাঠান মোগল" প্রভৃতি আসিয়া একত্র হইয়াছে। এখানে বৈচিত্র্য যে শুধু বেশী তাহা নয়। বড় অদ্ভুত রকমের। সুতরাং জীবন ধর্ম্মের নিয়মে যেখানে বৈচিত্র্য খুব বেশী সেখানে ঐক্যও তেমনি গভীর ও সুদৃঢ় হইতে হইবে। এই ঐক্যই ত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা-কল্পে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাতীয় একতা অনেক গুণে বেশী হওয়া দরকার, কেন না অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্য নাই। যেখানে বৈচিত্র্য অল্প—বা সহজ বা সাধারণ রকমের, সেখানে অল্প একতাতেই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। বিধাতার ইচ্ছায়

যাহা কঠিন ভারতবর্ষকে এ যুগে তাহাই সম্ভব করিতে হইবে। এবং ইহা ভারতবর্ষকে সম্ভব করিতেই হইবে,—কেন না বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার উপর মানবজাতির বিভিন্ন শাখা-জাতিগুলির পরস্পর মিলন একান্ত নির্ভর করিতেছে। আমার মনে হয়—ভারতবর্ষে যদি এক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা না হয়—তবে League of Nations প্রভৃতি যাহার পূর্ব্বাভাস বা সূচনা মাত্র সেই মানবজাতির বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী খণ্ড জাতিগুলির ভবিষ্যৎ মিলন—নিতান্তই আকাশকুসুম।

আমি আবার বলি, ভারতবর্ষে এক জাতীয়তা কঠিন হইলেও সম্ভবপর। বৈচিত্র্য বাধ নহে। বৈচিত্র্য যত বেশী ঐক্যও তত দৃঢ় হইবে। আমরা ইহা করিব। বিধাতা দায় স্বরূপ এই গুরুভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ভারতবাসীর ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করা কর্ত্তব্য। ভারতের এই বিভিন্ন ধর্ম্ম,—ভাষা,—ব্যবহার; এই বৃহৎ ভৌগলিক আয়তন—ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান--সমন্বয় সংঘটন করা, হইতে পারে কিঞ্চিৎ সময় সাপেক্ষ, কিঞ্চিৎ কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্লেশকর ভ্রমণ—তথাপি আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, ইহা ব্যতীত স্বরাজলাভ সম্ভব হইবে না। এইখানেই এবং এই প্রসঙ্গে এ যুগে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও তাঁহার বাণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত অধিক বলিয়া তাঁহার অতুলনীয় মণীষা,—তাঁহার অনুপম দেব-চরিত্র, তাঁহার অমানুষিক কার্য্য করিবার ক্ষমতার নিকট আমরা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়াও একটা গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করি। তবে মহাত্মা গান্ধীর নামে কেবল মাত্র গৌরব ও গর্ব্ব করিয়া কাল

কর্ত্তন সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। ভারতবর্ষে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি যে সৃষ্টি বা গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি আমাদিগকে পালন করিতে বলিয়াছেন—তাহা না করিতে পারিলে আশঙ্কা হয়—আমাদের এবারকার আয়োজন উদ্যোগ বুঝিয়া ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্য-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ আমি আর আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি না। কেননা, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মহাত্মা স্বয়ং এখানে উপস্থিত এবং তাঁহার মুখ হইতেই তাঁহার বাণী—আমরা শুনিতে পাইব। তাঁহার গঠনমূলক পদ্ধতির সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত দেশবাসীকে মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি। শুধু মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ যথেষ্ট নয়।

যাহা হউক, জাতীয় মুক্তির আদর্শ আলোচনার প্রসঙ্গে Independenceএর আদর্শের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার (order) বড় অভাব বলিয়া বোধ হয়। যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই বিবিধ উপকরণ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে—এক সুমহান্ ঐক্য স্থাপনের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা স্পষ্ট আমাদের বুঝা উচিত যে, যাহা আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি তাহার সহিত যেন আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট। যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক আবেষ্টন, তাহার মিল থাকে। আমার মনে হয়, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম বা সভ্যতার লোকেরা আছে, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য সংস্থাপনের জন্য প্রথমতঃ—

আমাদের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ—এই জাতীয় একতা স্থাপনের জন্য আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমি বলি না—যে তাহার জন্য আমাদের দুই হাজার বৎসর অতীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যখনি এই রকম কথা আমি বলিয়াছি তখনি অনেকে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহা নয়। আমাদিগকে সম্মুখে নবযুগে মহামিলনের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। তাহাকে রক্ষা করিয়া, উত্তরোত্তর তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এই যে শৃঙ্খলার (order) কথা আমি বলিতেছি—ইহা ইউরোপে যে ভাবে দেখা দিয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ হইলে চলিবে না। ইউরোপের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহার মূলে একটা সামরিক (Military) ভাব বা অভিযান যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমাজ ও শাসনযন্ত্রও এইরূপ একটা সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং রক্ষা পাইতেছে। আপনারা কেহ যেন মনে না করেন—যে এই প্রসঙ্গে আমি ইউরোপীয় সভ্যতাকে নিন্দা করিতেছি। ইউরোপের তথা ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের যে বৈশিষ্ট আমার চক্ষে পড়ে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি মাত্র। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাঁহারা রক্ষা করিবেন, চাই কি বৃদ্ধিও করিবেন। এবং করিতেছেনও। সমস্ত মানব সমাজের মধ্যে একটা ঐক্য থাকিলেও তাহাদের পথ আমাদের নয়। এবং আমাদের পথ তাঁহাদের নয়। তাঁহারা তাঁহাদের পথে চলিবেন—আমরা আমাদের পথে চলিব। উদ্দেশ্য এক তবে পথ কিছু

ভিন্ন। তৃতীয়তঃ—আমাদের পথে অগ্রসর হইতে কোন বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের বাধা দিতে পারিবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—Independenceর আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে—যাহা Independence এর আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ তাহাই স্বরাজ। Home-Rule এবং Self--Governmentএর যে আদর্শ তাহার মধ্যে আমি যেন ত্রুটি দেখিতে পাই। এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে যাহা আছে স্বরাজের আদর্শেও তাহা আছে। কিন্তু আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি—তাহাতে Rule অর্থাৎ শাসন এই কথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠে—তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া উঠে—তা সে শাসন ঘরেরই (Home) হউক অথবা—পরেরই (Foreign) হউক। Self-Government এরূপ বিরুদ্ধেও আমার ঐরূপ আপত্তি। কিন্তু কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্যই যদি Self-Government হয় তবে আমার আপত্তি বড় টিকে না—সত্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে স্বরাজের আদর্শে ইহার সমস্তই বিদ্যমান আছে।

তারপরে প্রশ্ন এই—আমরা যে জাতীয়মুক্তি লাভ করিব তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, না তাহার বাহিরে গিয়া? কংগ্রেস ইহার উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার তাহা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর যদি স্বীকার না করে—তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে।

কেননা জাতীয় মুক্তি আমাদের লাভ করিতে হইবে—ইহা নিশ্চিত। আমরা সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিব—কি সাম্রাজ্যের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িব—ইহার উত্তর আমাদের অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের যাঁরা নিয়ামক তাঁহারাই বেশী করিয়া বলিতে পারেন। একটা জাতি হিসাবে আমাদের জীবনধারণ করিতেই হইবে। শুধু জাতীয় জীবন-ধারণ নয়—জীবনকে প্রসার করিতে হইবে, পরিপূর্ণ করিতে হইবে, জাতীয় জীবনের এই বিকাশে বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি আমাদিগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়—তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা মুক্তিলাভ করিব। আর যদি সুযোগ না দেয়—সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়-জীবনকে পিষিয়া ফেলে তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়াই আমাদের স্বরাজলাভ করিতে হইবে। অন্যথা উপায় কি?

কিন্তু ইহা সত্য যে, আমরা যদি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি তবে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা ও সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত এখন আর প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ নাই। খণ্ড দেশ বা রাজ্যগুলি এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত থাকিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ। বাহ্যসম্পদ লাভের সুযোগ ও সুবিধার জন্য, স্বেচ্ছায় খণ্ডরাজ্যগুলি, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চায়। সুতরাং এই স্বাধীন ও চুক্তি মূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইচ্ছামত খণ্ডরাজ্যগুলি অসুবিধা বুঝিলে, সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে যখন খুসী

চলিয়া যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার একটা ভাব খুবই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন কি সাম্রাজ্যবাদী, কি খণ্ড ও স্বতন্ত্র রাজ্যবাদীগণ বুঝিতে পারিলেন যে উভয়ের পক্ষেই স্বাধীনতা-মূলক চুক্তিসর্ত্তে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে একসঙ্গে থাকাই শ্রেয়ঃস্কর। এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর জাতিসকলের বর্ত্তমান অবস্থায়, কোন এক দেশ বা জাতিই অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া, পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না—বাঁচিতে পারে না। এবং এই আদর্শের অনুপাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়া ও তাহার উন্নতি-কল্পে কোনরূপ বাধা না পাইয়া, যদি অগ্রসর হইতে পারে, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই লাভ করিতে পারে।

আমি নিজে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্য আর একটী বিশেষ কারণে উৎসাহ পাই। এই কারণটি রাজনৈতিক নহে—আধ্যাত্মিক। আমি জগতের পরিণামে একটা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সমগ্র মানবজাতির একটা মহামিলনের যে স্বপ্ন,—তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যগুলির বিশেষ স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তবে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন বিচিত্র শাখার মধ্যে এক অখণ্ড সুমহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড় কিছু কল্পনায় বা ধারণায় আসে না। যদি প্রত্যেক জাতির উদার হৃদয় ও অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে ব্রতী হন—তবে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলিকে, সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য আপাততঃ কোন কোন দিকে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদীগণ অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে দাসের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি লইয়া যে দেখা তাহা চিরকালের মত পরিত্যাগ করিবেন। আমি মনে করি—ভারতের মঙ্গলের জন্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষ—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হইলে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি মানবজাতিকে যে ভাবে সাহায্য করিতে পারে—ভারতবাসীও তাহা করিবেই এবং সম্ভবতঃ তাহার অতিরিক্তও কিছু করিবে। কেননা মানবজাতি ভবিষ্যৎ মহামিলনের একটা আদর্শ—ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইবে।

এক্ষণে জাতীয়-মুক্তির আদর্শ ছাড়িয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থিত করিব। আমার নিজের এইরূপ ধারণা যে, উপায়কে আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। উপায় আদর্শেরই একটা অংশ। কেননা, যখনি আমরা উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনি আমাদের মনের সম্মুখে উদ্দেশ্য বা আদর্শ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উপায় উদ্দেশ্য ছাড়া নহে। উদ্দেশ্য বা আদর্শের একটা অংশ।

এখন উপায় যদি আদর্শের একটা অংশ হয়—তবে হিংসা কোন

যুগেই আমাদের জাতীয়-জীবনের আদর্শ ছিল না—বা এখনও নাই—সুতরাং হিংসামূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেননা, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের ইতিহাস কোন বালকে পাঠ করিলেও আপনাদিগকে বলিয়া দিবে যে ইহা মিথ্যা। কিন্তু অনেক জিনিষ জোর করিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। ইতিহাস পাঠকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে যথার্থ স্বরূপ—তাহা হইতে তাহার উপর আরোপিত যে মিথ্যা আবরণ—তাহা অবশ্যই পৃথক করিয়া দেখিতে পারিবেন। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমন ভাবে নাই যেমন ইউরোপে আছে। এই হিংসামূলক অবাধ্যতা দূর করিবার জন্য ইউরোপে যে আইনের সাহায্য লওয়া হয়—সে আইনের ভিত্তিও পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার পালন করিয়া আসিতেছি। প্রাচীনতার প্রতি আমাদের স্বভাবের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে। কতকটা এই গতানুগতিক ভাবের জন্যই হিংসার ভাব আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কম। আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি অহিংসভাবে কাজ করিবার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানগুলিই—ফুল যে রকম আপনিই ফুটে—সেই রকম আপনা হইতেই বিকশিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য লইয়া তর্ক করিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন;—

মুমুক্ষু আত্মা—সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছে। কলহ ও বাদবিসম্বাদ—সালিশগণের সুপরামর্শে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে কোন উপায় এখন অবলম্বন করা যাইবে, তাহা যে শুধু নীতির বিরোধী হইবে তাহা নয়,—তাহা ব্যর্থ হইবে। কোন ফল প্রসব করিবে না।

আমি বলিতে দ্বিধা বোধ করি না—যে হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয়মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। তারপর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও—ইহা কিরূপে সম্ভব যে নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত, গভর্ণমেণ্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ডহিংসামূলক—প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসী বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সেই সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষরা তীর ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত। কখন বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে ঐ উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজশাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডেও এই শ্রেণীর বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।

তারপর ভারতবর্ষে জাতীয় একতা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে শৃঙ্খলা, যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের কথা আমি বলিয়াছি—এবং যাহা ব্যতীত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা, হিংসামূলক কোন উপায় অবলম্বন করিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্ভব হইবে। আমরা যদি হিংস্র হইয়া উঠি, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট

আরো অধিক হিংস্র হইয়া উঠিবে এবং এমন এক প্রচণ্ড দমন-নীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, যাহার ফলে স্বরাজ লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াও যাইতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যে সমস্ত যুবকগণ আছেন তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপামর সাধারণ দেশবাসী কি তাহাদের পক্ষ লইবে? যখন জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে, তখন যাহাদের বিপন্ন হইবে অথবা যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই বিদ্রোহের ছায়ার ত্রিসীমানার মধ্যেও থাকিবে না। সুতরাং এইরূপ বিদ্রোহ কার্য্যকরী হইবে না কিন্তু আমার কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই সমস্ত যুবকদের উদ্দেশ্যের সততা এবং স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যকে আমি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করিতেছি। তাহা নহে। আমি শুধু বলিতে চাই যে, এই উপায় আমাদের প্রকৃতির সহিত মিলিবে না আমাদের ধাতে সহিবে না, সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা শুধু "সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র।" বাঙ্গালায় বিদ্রোহমূলক উপায়ের প্রতি আশা স্থাপন করিয়া আছেন যে সকল যুবকগণ, তাঁহাদিগকে আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে ঐরূপ আশা যেন তাঁহারা অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন। আর বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলনকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে, এই উপায়ে স্বরাজ লাভ, কোনমতেই, করা যাইবে না।

কিন্তু আমি যেমন হিংসামূলক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে মত

প্রকাশ করিলাম, তেমনি আমি না বলিয়া পারি না যে গভর্ণমেণ্টের হিংসামূলক শাসনপদ্ধতিই বাঙ্গালাদেশে প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। আমার স্মরণ হয় যে, অধ্যাপক Dicey এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংরেজ-জাতি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর যে একটা সম্ভ্রম তাহা খুব বেশী রকম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সম্প্রতি ব্যবস্থা প্রণয়ন-কার্য্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে আদালতের যে ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল এখন তাহা অনেকাংশে খর্ব্ব করা হইয়াছে। ইহাতে আইন রক্ষার প্রতি পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই প্রমাণ হয়। বস্তুতঃ হিংসা দ্বারা হিংসারই সৃষ্টি হয়। গভর্ণমেণ্ট যদি প্রজাশক্তির ন্যায্য দাবী, ন্যায্য আন্দোলনে—অযথা বে-আইনী রকমে বাধা প্রদান করেন তবে অধ্যাপক Diceyর কথায় প্রজাশক্তির মধ্যে বে-আইনী অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করিবার একটা স্পৃহা আপনা হইতেই সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতিহাস বিশেষভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস অধ্যাপক Diceyর কথার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে এই রাজদ্রোহিতা এই বিদ্রোহের আব-হাওয়া একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। যেমন অন্যদেশে তেমনি এখানেও, এই আব-হাওয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম স্তরে একটা সাধারণ রকম অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। তাহার কারণ শতবর্ষব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফল। কেন না, প্রায় দীর্ঘ একটী শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজরাজ, ইংরেজ দ্বারা ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য এদেশ শাসন

করিয়াছিলেন মাত্র। এই অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য ১৮৫৮ খৃঃ, সিপাহী বিদ্রোহের পর, আরো ঘনীভূত হইয়াছে। ১৮৫৮খৃঃ কোম্পানীর হাত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ইংলণ্ডের রাজার অধীনে যাইয়া পড়ে। বিশেষভাবে এই সময় হইতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত —ভিক্টোরিয়া যুগের বেশীর ভাগ—ভারতবর্ষকে এক বিদেশীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসন করা হইয়াছে। এবং এই সময়ে ভারত-বাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। এই যুগের ইংরেজ শাসনের বিশেষত্ব যে কেবল ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা, তাহা নহে—ইহার সব চেয়ে বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া যুগের শেষাশেষি, —প্রজার হিতের জন্য কতকগুলি সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি—আপনারাও জানেন। যেমন Lord Ripon এর Repeal of the Vernacular Press Act. The Inauguration of the Local Self-Government, The Ilbert Bill এবং Revision of the Indian Councils Act, 1891,ইহাLord Lansdownce এর সময়ে হইয়াছিল। ইহাকে আমি কতকটা Benevolent Despotism বলিতে চাহি। কেননা, এই সমস্ত সংস্কারের ভিতরকার কথা ছিল—আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাইয়া আমলাতন্ত্রের শক্তিকে আরো অপ্রতিহত করিয়া তুলা। কেবল এক Local Self-Governmentই প্রজার হিতের জন্য বলিয়া ইতিহাসে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যদি

তলাইয়া দেখা যায়—তবে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে—ইহা মুখে যত বলে কাজে তার কিছুই করে না।

প্রকৃত পক্ষে Local Self Government এর ব্যাপারে আমলাতন্ত্র এমন কোন ক্ষমতাই প্রজার হাতে ছাড়িয়া দেয় নাই, যাহা দ্বারা প্রজা নিজের ইচ্ছামত নিজেদের কোন হিতসাধন করিতে পারে! অন্যদিকে Lord Lyttonএর Vernacular Press Actএর Lord Dufferin এর শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতের উপর ঘৃণাসূচক উক্তি ও তাচ্ছিল্য এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কল্পে অতি নীচ মনেব পরিচয় এ সমস্তই পরবর্ত্তী কালের ঘনীভূত বিদ্রোহমূলক আব-হাওয়া সৃষ্টির পক্ষে একের পর আর সাহায্য করিয়া আসিতেছিল।

তারপর আমরা দ্বিতীয় স্তরে আসিতেছি। ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে বিদ্রোহের আব-হাওয়াকে এই দ্বিতীয় স্তরে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়া, ইহাকে উদ্বোধন করিবার ভার লইয়াছিলেন—লর্ড কার্জ্জন। লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারিতা ও দাম্ভিকতাই এই দ্বিতীয় স্তরের রাজদ্রোহিতার প্রবর্ত্তক। তিনিই লাটদিগের মধ্যে প্রথম শাসনকার্য্যের সুবিধাকে (administrative efficiency) প্রজার হিতের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তিনি এই শাসন কার্য্যের সুবিধারূপ ধূয়া ধরিলেন—অন্যদিকে শিক্ষিত ভারত-বাসীর মতামতকে অতি যথেচ্ছ রকমে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রজাশক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাতীয় আন্দোলনকে—সারকুলারের পর সারকুলার জারী করিয়া তাহাকে যেন গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ইহা এক দিকে প্রচণ্ড দমননীতির সূত্রপাত করিল—

অন্যদিকে দেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে প্রকৃতই রাজদ্রোহিতার এক বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল। যাহা বীজাকারে ছিল তাহা অঙ্কুরিত হইল। ইহাই রাজদ্রোহিতার ভাব-ধারায় দ্বিতীয় স্তরের দ্যোতনা।

লর্ড কার্জ্জনের পর আমরা তৃতীয় স্তরে আসিয়া উপনীত হইতেছি। বীজ অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। গর্ত্তে লুকাইয়াছিল যে সাপ—লর্ড কার্জ্জন বাঁশী বাজাইয়া তাহাকে গর্ত্ত হইতে সাধ করিয়া বাহিরে আনিয়াছেন। সাপিনী ফণা তুলিয়াছে। একটা দংশন না করিয়া যায় কোথায়? তৃতীয় স্তরের লক্ষণ যে, যাহা ভাবাকারে আব-হাওয়ার মধ্যে ঘণীভূত হইতেছিল—তাহা একটা বিষাক্ত দংশনে অতি ক্ষুদ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল। লর্ড মিণ্টোর রাজত্বকালে—আমলাতন্ত্র তাহার হিংস্রমূর্ত্তির যে কোমল মসৃণ মকমলের বহিরাবরণ, তাহাও দূরে ফেলিয়া দিল—এক নগ্ন বীভৎসতা সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে এক শ্রেণী ইহাতে ভীত হইল না, কিন্তু তাহারা অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বোমা ও রিভলভার হস্তে ধাববান হইল। কাহারো নিষেধ শুনিল না। ইহাই তৃতীয় স্তর।

ভারতে রাজবিদ্রোহের মূলে যে মনঃবৃত্তির বিশ্লেষণ ও বিকাশ আমি দেখিলাম, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ঘাত-সংঘাতের দানবীয় লীলাভিনয় আপনারা দেখিলেন, ইহাকে আরো সম্পূর্ণ করিয়া দেখা হইবে, যদি আপনারা আরো দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

দেখেন। ইহা সত্য যে, রাজশক্তির অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, অযথা নির্ব্বিচারে সমস্ত দেশের উপর প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অসীম অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা হইতেই রাজদ্রোহের আব-হাওয়া জন্ম লাভ করিয়াছে। তথাপি—ভারতের বাহিরের কতকগুলি ঘটনাও এই সম্পর্কে আমাদের মনে না আসিয়া পারে না। যেমন ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান কর্ত্তৃক রুষের পরাজয়, তাহার ফলে সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ডে একটা নব-জাগরণের সূত্রপাত,—মিসরের স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীরদিগের গরিলা যুদ্ধের সফলতা, আইরলণ্ডের প্রজাতন্ত্র-বাদীদের বিদ্রোহমূলক প্রচেষ্টা, এবং সোভিয়েট রাসিয়ার পৃথিবী-কম্পনকারী বেলসেভিক্ অভিযান, সর্ব্বশেষে এঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টের সিংহাসনতলে ইংরাজ ও গ্রীক জাতীর নতজানু হইয়া অবস্থান, ইহা সমস্তই একের পর আর আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে—উঠিতেছে। তাহার ফলে এক শ্রেণীর ভারতবাসী চিন্তা করিতেছেন যে, যে কোন উপায়েই হউক আমরাও স্বাধীনতা লাভ করিব।

আপনাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এই সম্পর্কে ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ এই পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার একটা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা আমি আমার অভিভাষণের পরিশিষ্টভাগে দিলাম। ১৯০৯ খৃঃ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমি ঐ তালিকাতে দেই নাই। আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত ঘটনা ইহারি মধ্যে আপনারা ভুলিয়া উঠিতে পারেন

নাই। ১৯১২ খৃঃ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়। দিল্লী চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। Defence of India Actএ বহু লোককে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়,—রাউলাট আইন পাশ করা হয়,—জালিওয়ানালাবাগের লোমহর্ষণ বর্ব্বর-সুলভ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়, কেমাগাটা মেরু, চরমাইনারের ঘটনা—এ সমস্তই আপনাদের স্মরণ আছে।

সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজ-অত্যাচারের পরেই একটা রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত হয়। আবার এই রাজ-দ্রোহিতার পরে পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচায় আত্মপ্রকাশ করে। খালি তাই নয়,—যখনি গভর্ণমেণ্ট আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোন আইন পাশ করেন—আবার ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দমন-নীতি সমর্থন করিয়া আর একটা আইনও পাশ হয়।

জালি ওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরেই মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভের জন্য এ যুগে আবার নূতন করিয়া এক অহিংসা-মূলক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করেন। আমরা সকলেই আশা করি যে, আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত মহাত্মা গান্ধীর এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। করিবে কি,—করিয়াছে। হিংযা-মূলক পদ্ধতি—কি গভর্ণমেণ্ট, এবং কি হিংসা-মূলক বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ভারতবাসী, উভয়েই ইহা পরিত্যাগ করিবেন। কেননা, ইহা দ্বারা কেহই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে না।

এই যে নূতন Ordinance Act, ইহার দ্বারা ভারতবাসীর উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন বৃদ্ধি করা হইবেমাত্র। ইহার মূলে

কোন বিচার বুদ্ধি নাই। সমগ্র ভারত একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমার নিজের মনের ভাব যথোপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে আমি ভরসা পাই না। কেননা, আমি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছি যে, খুব সংযত ভাষায় আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিব। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহার উচ্ছেদ কামনা করি। Lord Birkenhead ভারত গভর্ণমেণ্টের এই দমন-নীতি-মূলক আইন সমর্থন করিয়া আমাকে এই গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিবার জন্য যে সাদর আহ্বান করিয়াছেন—তাহার উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছি—কোন ভারতবাসীই, তাহার উত্তরে অন্যরূপ বলিতে পারে না।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে—Lord Birkenhead বলিয়াছেন যে—এই Ordinance আইন দ্বারা কেবল অপরাধী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই অসুবিধা ভোগ করিবে না। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিবার স্পর্দ্ধা করি যে Lord Birkenhead এক্ষেত্রে অতি মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহাদিগকে এই Ordinance আইনের বলে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়, আমরা স্বীকার করি না যে, তাহারা অপরাধী। তাহারা অপরাধী কি না—তাহা বিচারের পূর্ব্বে কেহই স্থির করিতে পারে না। পুলিশ বা সি, আই, ডি-র গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা বিচার নহে—অপরাধ সাব্যস্ত নহে। ইহা অবিচার। ইহা অত্যাচার। ইহা সভ্যতাভিমানী—ন্যায়-বিচারাভিমানী সমগ্র ইংরেজ জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক! অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য সাক্ষী-প্রমাণ লইয়া প্রকাশ্য

আদালতে বিচার হউক। ইহা অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সুবোধ বালকেও ইহা বুঝিতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করিবার ক্ষমতা কেবল আদালতের হস্তেই ন্যস্ত। আদালত বিচার করিয়া যাহা স্থির করিবে—Executive বা শাসনবিভাগ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে মাত্র। কিন্তু যদি Executive বা শাসনবিভাগ নিজেই বিচার করিতে বসে—যিনি হুকুম পালন করিবেন, তিনিই যদি হঠাৎ হুকুম করিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রজার স্বাধীনতাকে এমন যথেচ্ছ নিষ্ঠুরভাবে অপহরণ করা হয় যে, সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ইতিহাস-লেখকগণ খুব বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই লিখিয়াছেন। Lord Birkenheadতাঁহার নিজের দেশের ইতিহাস পড়েন নাই, এমন কথা কোন অর্ব্বাচীন বলিতে সাহস করিবে?

যখনি নূতন করিয়া গভর্ণমেণ্ট একটা দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়াছে তখনি তাহার সমর্থনের জন্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে। সেই সব ঘটনার প্রত্যেকটির কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি আমি করিব না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু Bengal Ordinance সম্বন্ধে Legislative Assemblyতে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে এবিষয়ে খুব বিস্তৃত রকমে সব কথাই তিনি বলিয়াছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে সেই বক্তৃতাটি পড়িতে বলি। কেন না, তাহাতে পণ্ডিতজী গভর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ ঘটনা হইতে কোন মতেই কোন প্রকারে দমন-নীতি প্রয়োগের অজুহাত বা অছিলা পাওয়া যাইতে

পারে না। দমন-নীতি প্রয়োগের সময় গভর্ণমেণ্ট যে কৈফিয়ৎ ও যে ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্তের কথা আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। ১৯০৮ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর—স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ৯জন বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। লর্ড মর্লি তখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। এই সম্পর্কে Lord Mintoকে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি ৯জন ব্যক্তিকে, এক বৎসর হইল কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কারণ আপনি বিশ্বাস করেন যে তাঁহারা রাজ দ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত অবৈধরূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। এবং আপনি আরও বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে, উল্লিখিত ষড়যন্ত্রগুলির দমন হইবে।"

এখন আপনারা শুনুন Sir Hugh Stephenson এই সম্পর্কে Bengal Councilএ মাত্র সেদিন কি সব কথা বলিয়াছেন—

—"আমাদের দমন-নীতির অবলম্বিত উপায়ের অপ-প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমি তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম দুইটি অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পর্কে। সংবাদপত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, এই দুই জন রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত কোন প্রকারে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে পুলিশের গোপন সংবাদ সম্পূর্ণই মিথ্যা। এবং পুলিশের এই প্রকার গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া তখন যেরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রতারিত হইয়াছিলেন—এখনও সেইরূপ হইতে পারেন। আমি বাবু অশ্বিনীকুমার

দত্তকে জানিতাম না। কিন্তু আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই—ইহা আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি তাহাতে কৃষ্ণ বাবু, কি অশ্বিনীকুমার দত্ত কেহই রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রকে উৎসাহ দিবার—বিশেষতঃ উক্ত ষড়যন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে থাকিবার অভিযোগ কেহই করে নাই। অশ্বিনী-কুমার দত্ত সম্বন্ধে Bengal Government যে Regulation IIIর প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার কারণ অশ্বিনী বাবু গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানাস্থানে বক্তৃতার এক তুমুল ঝড় তুলিয়াছিলেন।"

সুতরাং ইহা প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে, এদেশে অবৈধ আইন প্রচলন করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের আছে, এবং সেই সঙ্গে ঐ অবৈধ আইনের অপ-প্রয়োগেরও যথেষ্ট অবসর আছে। আমাদের যেরূপ অবস্থা—আর গভর্ণমেণ্টের যেরূপ ব্যবস্থা—তাহাতে এরূপ না হইয়া যায় না। জগতের ইতিহাস এই কথারই প্রমাণ দেয় যে, আমলাতন্ত্রের গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রই—আইন ও শৃঙ্খলার ("Law and Order") অজুহাতে তাহাদের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করে। আইন ও শৃঙ্খলা—কথাটি শুনিতে খুব ভাল। কিন্তু আমাদের মত দেশে—যেখানে (আইনের রাজত্ব) "Rule of Law" নাই—সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার নামে—আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা-মদ মত্ত ব্যক্তিগণ কেবল তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে অপব্যবহার ও অত্যাচারে পরিণত করে মাত্র। আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার এক উপায়—দমননীতির প্রয়োগ। এবং গভর্ণমেণ্টের এই অযথা হিংসামূলক দমন-

নীতির প্রয়োগকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। যেমন আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রজার পক্ষ হইতে হিংসামূলক রাজ-দ্রোহিতাকেও ঘৃণা করি। আমি গভর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটা দায়িত্ব অনুভব করিতেছি যে, অযথা দমন নীতির প্রয়োগ রাজ্যশাসনের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। অতি অল্প সময়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট ইহার বলে—আপন ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি আশা করি Lord Birkenhead মনে মনে বুঝিতে পারেন যে—এ উপায়ে রাজ্য শাসন চলিবে না।

যাহা হউক—জাতীয় মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার আলোচনা করিয়াছি। হিংসা-মূলক রাজদ্রোহীতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেননা, এই উপায় প্রথমতঃ নীতি-বিরোধী; দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না। ইহা নীতি-বিরোধী; কেননা, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় সভ্যতার সহিত ইহার মিল নাই। ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না, কারণ ইহা ধারণাই করা যাইতে পারে না যে, আজিকার দিনে এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টকে কয়েকটা বোমা ও রিভলভারের গুলিতে আমরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিব।

তারপর প্রশ্ন, সেই চিরন্তন প্রশ্ন—তবে "মুক্তি কোন্ পথে"? কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব? খুব বিজ্ঞতার সহিত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে Reform Act অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিলেই স্বরাজ একেবারে

আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে। ইহার উত্তরে আমার যাহা বলিবার—তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া আবার আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, কেহ এই প্রসঙ্গে আমার অভিপ্রায়কে অস্পষ্টতা দোষে দোষী করেন। আমি যদি বুঝিতাম এই Reform Act এ সত্যিকার কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব যথার্থই আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার বলে—আমরা জাতীয় অভাব সকল পূর্ণ করিয়া, জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি—তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া Council Chamber এর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠন-মূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীদিগকে সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নই। Reform Act যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই, তাহা আবার আজ আপনাদিগের নিকট বুঝাইতে গিয়া অযথা সময়ের অপব্যবহার করিব না। আপনারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ ইহা আপনাদিগকে দেখাইয়াছে। দেখাইতে পারিয়াছে। আপনারা যদি এ সম্বন্ধে যুক্তি চান—বিচার করিতে চান—তবে আমার আমেদাবাদ কংগ্রেসের বক্তৃতা আবার আপনাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে বলিব মাত্র। যদি আরও নিঃসংশয় হইতে চান, তাহা হইলে Muddiman Committeeর সমক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে—তাহা আর একবার পাঠ করিবেন। এবং এমন সমস্ত লোক ঐ সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, স্বয়ং গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের ধীরতা ও রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় করিতে পারেন না। বর্ত্তমান Reform Actর আসল

কথা হইতেছে এই যে, গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করেন না। অবিশ্বাস করেন। এবং যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের মধ্যে থাকে, সেখানে সেই অবিশ্বাসের আব-হাওয়ার মধ্যে সহযোগিতা বা একত্রে কাজ করিবার কথা মুখেও আনা যায় না। তথাপি গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করা সম্বন্ধে আমার মত আমি সুস্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। আমি আশা করি, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন আমার সহিত একমত হইয়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতই প্রকাশ করিবে। আমার কথা এই যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই—কেবল যদি গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দেন এবং কাজ করিতে কোন বাধা না দেন। তবে এই একত্রে কাজ করাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের আমাদের প্রতি মনের ভাব যথার্থরূপে পরিবর্ত্তন হওয়া চাই,—দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ স্বরাজ নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে আপনা হইতেই বিনা বাধায় যাহাতে আমরা পাইতে পারি, এখনই তাহার সূত্রপাত করা দরকার। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগকে এমনভাবে কথা দিবেন যে, তাহার যেন আর নড়চড় না হইতে পারে।

আমি বরাবর বলিয়াছি যে, গঠন-মূলক কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতীয় ইতিহাসে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পথে, কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান, খুব বেশী সময় নয়। অবশ্য সেই পথে, অগ্রসর হইতে এখনি যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজ লাভের ভিত্তি যদি এখনি প্রতিষ্ঠিত হয়—এবং যথার্থরূপে যদি আমাদের

ও গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। আমি জানি আপনারা বলিবেন 'মন পরিবর্ত্তন' একটা সুন্দর কথা মাত্র—উহার কোন অর্থ নাই—প্রকৃত কাজে উহার পরিচয় প্রমাণ আমরা চাই। ইহা খুব সত্য—এবং আমিও ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথা কাজে পরিচয় দিবার জন্য, রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা নূতন আব-হাওয়া সৃষ্টিও হইতে পারে যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া একটা মিটমাট বা আপোষের প্রস্তাব হয়। উভয় দলের মধ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস উভয় দলেই-অতি সহজে অনুভব করিতে পারে। ধীর ও শান্তভাবে সত্য যদি কোন আপোষের প্রস্তাব হয়—তবে তাহার স্বার্থকতার জন্য, আমি মনে করি, সেই আপোষের সর্ত্ত (Terms) গুলি অপেক্ষা, ঐ সমস্ত সর্ত্তের (Terms) পশ্চাতে যে মন আছে, সেই মানসিক অবস্থার প্রতি অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। উভয়পক্ষের মন যদি সরল হয়, সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে। অন্যথা সফলতার কোন সদুপায় আমি ত দেখি না। বর্ত্তমান অবস্থায়—এখনি—আপোষের জন্য নিশ্চিতরূপে সর্ত্ত (Terms) উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সত্যি, কর্ত্তৃপক্ষের মন যদি সরল হইয়া আসে, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া—শান্ত ভাবে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে—তবে আপোষের সর্ত্তগুলিকে স্থির নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অধিক কাল বিলম্ব হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের মনের ভাব আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি—তাহাতে আভাসে কতকগুলি সর্ত্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমন-নীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। এবং

তাহার প্রমাণস্বরূপ—রাজনৈতিক বন্দীদের সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকট-বর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার কোন নড়চড় হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ—পূর্ণ স্বরাজ লাভের পূর্ব্বে—ইতিমধ্যে এখনি—আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজ লাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন পূর্ণ স্বরাজ লাভের পথে কি ভাবে এই বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে, কোন দিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা মিট-মাট-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে। এবং এই কথাবার্ত্তা কেবল যে গভর্ণমেণ্ট ও সমগ্র প্রজাশক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে। দেশের সকল বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। দেশের ইউরোপীয় ও Anglo Indian সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হইবে। আমার গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে, আমি একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি।

আমি একথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গভর্ণমেণ্টের সহিত এমন একটা সর্ত্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাব-ভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না,—অবশ্য এখনো দেই না,—এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে

দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, তাহা নয়—কেননা, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন,—কোনদিনই রাজদ্রোহমূলক কোন প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইলে—তাহার ফলে স্বতঃই রাজদ্রোহীদের মনেও একটা পরিবর্ত্তনের ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। এবং আমি যে ভাবের একটা আপোষের আভাস এইমাত্র দিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে,—রাজদ্রোহের আন্দোলন একটা অতীতের বস্তু হইবে মাত্র—বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না—এবং যে শক্তি ও সামর্থ্য ভ্রান্তপথে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োগ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে, তাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে।

তার পরের কথা, যদি আমাদের আপোষের প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কি করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা গত দুই বৎসর কাল যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছি—সেই পথে—সেই ভাবেই কার্য্য করিতে থাকিব। এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে—গভর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয় করা ভিন্ন—স্বাভাবিক নিয়মে—শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন না। যেমন এখন পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এরূপ করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহারা যুক্তিও দেন। বাজেটের প্রস্তাবে বাধা

দিবার নাকি আমাদের নৈতিক অধিকার নাই। কেননা, তৎপূর্ব্বে আমাদের নাকি প্রজাদের নিকট যাইয়া ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

এই কথার উত্তরে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট অহিংসামূলক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আব-হাওয়া সৃষ্টি করা। স্বাধীনতা-প্রয়াসী পর্য্যুদস্ত আমরা—আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্ব্বপ্রথমেই পাশুপথ প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই—কোন বীরই তাহা করে না,—আমরাও সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করিব না। কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে,—শেষ যখন আমাদের সম্মুখে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না—ভীত হইব না। কেননা, আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল—তাহারই যুদ্ধ। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই—কিছু আসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মত—কোন একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারে না। একদিকে বর্ত্তমান যুগের নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞান সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র সেনা-সমাবেশ—অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ অগণন

৩৫ কোটী নর-কঙ্কাল। ক'টিমাত্র বস্ত্র আবরণে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত বিগ্রহ—ভারতের প্রধান সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়া, আমাদিগকে এই সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়াছেন।

হে আমার দেশবাসী ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, সত্যি আমাদের বর্ত্তমান ঘাত-সংঘাতের কোন প্রতিধ্বনি কোন জাতির অতীত ইতিহাসে দেখা যায় না। বজেট প্রস্তাবে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার যদি অনুরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই আপনাদের এত আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিব। আপনারা কি জানেন না যে, ষ্টুয়ার্টদিগের রাজত্বকালে, যখন প্রজারা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পার্লামেণ্টে প্রজাশক্তির প্রতিনিধিগণ বজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন। অহিংসা-মূলক অবাধ্যতার আব-হাওয়া সৃষ্টি করিবার উপায়, গভর্ণমেণ্টকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে বাধ্য করা। আমরা বজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়া সফল হইলেই গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে উদ্যোগী হইবে। এবং সেই সময় যদি নিতান্তই আসে, তবে আমরা আমাদের দেশবাসীগণকে ঐরূপ অবৈধ উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে বাধা দিবার জন্য পরামর্শ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না।

তবু আমি আশা করি—সেই সময় হয়ত আসিবে না কেননা, চারিদিকেই মনের একটা পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু যদি আপোষের সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়—সকল ভরসা নির্ম্মূল

হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই ভারতবাসীকে অহিংসা-মূলক অবাধ্যতা (Civil Disobedience) গ্রহণ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই ব্রহ্মাস্ত্র সুযোগ বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আপনাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে Civil Disobedience শুধু মুখের কথা নয়। Civil Disobedience করিতে হইলে—

—দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় রকমের একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজন হইবে।

—আত্মোৎসর্গের জন্য অসীম সহিষ্ণুতা ধারণ করিতে হইবে।

—ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থের নিকট বলি দিতে হইবে।

আমার আশঙ্কা হয়, মহাত্মা গান্ধীর গঠন-মূলক কার্য্য পূর্ণ রকমে সফল না হইলে Civil disobedience সম্ভবপর হইবে না। তথাপি আমাদের আদর্শকে সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে। কেননা, যে রকমেই হউক স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করিবই।

তবে আমি বলিতেছি যে—আপোষের সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি। সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি দেখিতেছি—বিচ্ছিন্ন মানব জাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্য মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতে এই মহা-মিলনে ভারতবর্ষ খুব বেশী সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে—মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাঁহার যুগ-যুগান্তের অমরবাণী লইয়া সমুপস্থিত। বৃটিশ রাজনৈতিকগণ কি পথের কণ্টক হইবেন? আমি আশা করি না। তাঁহাদিগকে আমি বলি যে, তোমরা শান্তি লাভ করিতে পার—যদি আপোষ কর। আপোষের সর্ত্তগুলি তোমাদের ও আমাদের উভয়পক্ষেরই সম্মানজনক হইবে। ভারতের ইংরেজ সম্প্রদায়কে আমি বলি যে, তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার অধিকারী একটা মহিমজাতির বংশধর—আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কি তোমরা সাহায্য করিবে না? আমরা ত এদেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকারের স্বত্ব সর্ব্বদাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বাঙ্গালার উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে আমি বলি যে—তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে—এ যুগে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ—বহু কষ্ট পাইয়াছ,—তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনো সময় আসে নাই,—যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনো তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা—তাহা কদাপি ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলন-মন্দিরে—সমুন্নতশিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে—এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি! তোমরা তখন সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না।

বীর যে সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়। মিলন-মন্দিরের যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে—এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে—ইহারা বিনয়ে ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত করিয়াছে।

জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এইজন্য প্রয়োজন যে—ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয়। এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্ত্তগুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহূত হইবে—তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই—

—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্ম্মের —আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগীভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত এক জাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই সমগ্র ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।

—ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন, সাম্রাজ্যের এক মহামিলনের অঙ্গীভূত। সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরে একটা বিরাট

অঙ্গের মত অবস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যের বল, সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

—প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির স্বাধীনতার স্বার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে।

জাতিতে জাতিতে মিলন—পৃথিবী-পৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।

বন্দে মাতরম্‌

দার্জ্জিলিং গমন

ফরিদপুর অভিভাষণের পর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য দার্জ্জিলিংএ গমন করেন। কর্ম্মী সেখানেও কর্ম্মবিহীন জীবনযাপন করিতে পারেন নাই। সেখানে গিয়াও তিনি রাজনীতিক ব্যাপারে গুরু পরিশ্রম করিতেন ও ভবিষ্য কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যে সমস্ত পত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠে আমরা বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

দার্জ্জিলিংএ অবস্থানকালে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার জ্বর আসিত; পরদিবস সোমবার জ্বর ত্যাগ হইত। জ্যোতিষীর কথানুসারে তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ৬৩ বৎসর বয়সের

পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু কিছুতেই হইবে না। এজন্য তিনি শারীরিক অসুস্থতাকে কোনরূপ আমলই দিতেন না।

মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে ১৩ই জুন শনিবার তিনি জানিতে পারেন দোয়ার্কী ধ্বংস হইয়াছে, তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হইয়াছে।

১৪ই জুন রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে "ষ্টেপ এসাইড" নামক তাঁহার বাসভবন হইতে দিঘাপাতিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ রায়ের "গিরিবিলাস" ভবনে পদব্রজে গমন করেন। এবং পদব্রজেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রতিদিনই তিনি সুদীর্ঘ পথই পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। ১৪ই জুন রবিবার সন্ধ্যা অবধি তাঁহার জ্বর আসিল না দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী বলিলেন—"তুমি দিনরাত ভাব জ্বর আসবে—আর তোমার জ্বর আসবে না।" শোনা যায়, শরীর সুস্থ বোধ করায় তিনি সেদিন কিছু অধিক পরিমাণে সান্ধ্য-আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কতকগুলি রাজনীতিক কার্য্য শেষ করেন। তখনও তাঁহার শারীরিক কোনরূপ অসুস্থতা বা বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নাই। রাত্রি ১১ টার সময় ১০৩ জ্বর হয় ও মাঝে মাঝে কম্প আসিয়া ত্যাগ হইতে লাগিল। তখনও আশঙ্কার কোন কারণ দেখা দেয় নাই। পরদিবস সোমবার ১৫ই জুন বেলা ১১টার সময় হইতে গাত্রবেদনা ও শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইল। তখনি ডাক্তার ডি, এন, রায়কে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া রোগী দেখিয়াই রোগীর জীবনের আশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশা প্রকাশ করিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল।

পরদিবস মঙ্গলবার ১৬ই জুন ২রা আষাঢ় প্রভাতে দেখা গেল, তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে; তখন অর্থসহ স্যার নীলরতন সরকারকে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করা হইল। কিন্তু তাঁহাদের আর দার্জ্জিলিং যাইবার প্রয়োজন হয় নাই।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় রোগীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাঁহাকে তখন অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়; তৎপূর্ব্বেই বেলা ৪—৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত অমরাত্মা দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করে। এই শোকাবহ সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে "ষ্টেপ এসাইড" ভবন লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। দেশবন্ধুকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য সকলেই শোকাশ্রু নয়নে উৎসুক প্রাণে ১০।১২ মাইল দীর্ঘ পথ হইতেও আগমন করে। আর বাসন্তীদেবী! পতিপ্রাণা, পতিগতপ্রাণা বাসন্তী দেবী, সুদীর্ঘ কালের চির সুখ-দুঃখের সহচরী বাসন্তী দেবী—তিনি প্রিয়তম স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। একে দেশবন্ধুর শোক তাহাতে বাসন্তীদেবীর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া—এ দৃশ্যে সকলেরই নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গে তিনি দার্জ্জিলিংয়েই শবদাহ করিতে চাহেন। এদিকে শব কলিকাতায় দাহ করিবার ও আনয়ন করিবার জন্য রাশি রাশি টেলিগ্রাফ আসিতে লাগিল। তখন কলিকাতাতেই শব প্রেরণ করা সাব্যস্ত হইল।

কলিকাতায় শব প্রেরণ

তখনকার অস্থায়ী গবর্ণর স্যার জনকার, শাসন পরিষদের সিনিয়র মেম্বার স্যার আব্দার রহিম, মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, স্যার হিউ ষ্টিফেনসন, স্যার জগদীশ বসু, লেডি বসু, প্রভৃতি সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সে রাত্রিতে কলিকাতায় শব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। তখন শবাধারে শব রক্ষা করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। সে রাত্রি দার্জ্জিলিংবাসী সকলেই বিনিদ্ররজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস বেলা ৯॥০টার ট্রেনে বিরাট শোভাযাত্রা ও বিপুল সংকীর্ত্তনের ভিতর দিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাসের শব কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। অস্থায়ী গবর্ণর স্যার জনকার স্বয়ং রেল-কর্ত্তৃপক্ষকে আদেশ করেন, চিত্তরঞ্জনের আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছানুসারে যেন রেলকর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যবস্থা করেন। শবদেহ ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়। বাসন্তী দেবী, মায়া বসু, মিসেস কিরণচন্দ্র দে, দেশবন্ধুর কনিষ্ঠা কন্যা ও কনিষ্ঠ জামাতা ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। ট্রেন শিলিগুড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা হইতে আগত ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদার, পাবনা হইতে আগত ভাগ্যহীন চিররঞ্জন প্রভৃতি আরও বহুলোক মিলিত হইলেন। পথিমধ্যে যে কোন ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়াইয়াছে সেইখানেই সমবেত

জনতা ও নেতৃবৃন্দ শবের উপর পুষ্প ও পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাদের জাতীয় নেতার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন ও নিবেদন করেন। ট্রেন বারাকপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা হইতে মহাত্মা গান্ধী, মিঃ এস, আর দাস, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়, অপর্ণা দেবী ও চিররঞ্জন দাসের সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি মিলিত হইলেন।

কলিকাতা

সকাল ৬টায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শব শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিবে জানিয়া রজনী তিনটা হইতে সর্ব্ব জাতি দলে দলে সারিবন্দী ভাবে শিয়ালদহ ষ্টেশন অভিমুখে গমন করিতে থাকে। সে বিপুল জনস্রোতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মারাঠী, শিখ, গুজরাটী, ভাটিয়া, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সকল জাতি ও শ্রেণীই আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত হইতে লাগিলেন। দেশনেতৃবৃন্দ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবর্গ, কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিলারগণ ও অপরাপর কর্ম্মচারিবৃন্দ, কংগ্রেসকর্ম্মী, খেলাফৎ ও আকালীদল, এবং কীর্ত্তনের দল আসিয়া সমবেত হইলেন। দলে দলে কংগ্রেসের

স্বেচ্ছাসেবকেরা ও পুলিস প্রহরীবর্গ মিলিত হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে লাগিলেন। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, জনস্রোতও ততই বাড়িয়া চলিল। সকাল ৬টার সময় দেখা গেল, শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কলেজষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত কেবলি অগণিত নরমুণ্ডশ্রেণী। নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। গৃহের ছাদে, বারাণ্ডায়, ফুটপাতে, বৃক্ষে, গাড়ির উপর হাজার হাজার নরনারী, বালকবৃদ্ধ উৎসুক চিত্তে সাশ্রুনয়নে শবের আগমন ও দেশবন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোথায়ও তিলধারণের স্থান নাই। এরূপ বিপুল জনসমাগম ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। আর কোন জননেতা এরূপ সম্মানও লাভ করেন নাই।

পথে বিলম্ব হওয়ার দরুণ প্রায় ৭টার সময় দার্জ্জিলিং মেল শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, ভাগ্যহীন চিররঞ্জন, জামাতা সুধীরচন্দ্র রায় এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শবাধার হইতে শব উত্তোলন করিয়া কুসুমদামে সজ্জিত শ্বেতবর্ণের খাটে স্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তবৃন্দ শবের উপর রাশি রাশি পুষ্পমাল্য ও ভক্তিঅর্ঘ্য দান করিলেন। মহাত্মা গান্ধী, পুত্র চিররঞ্জন প্রভৃতি শব বহন করিয়া ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইলেন। বিপুল জনসঙ্ঘ চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় সজলনয়নে শোকার্ত্তচিত্তে নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে বাঙ্গালীর গৌরব—ভারতের শ্রেষ্ঠনেতার নশ্বর দেহ প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইল। যে পারিল

সেই দেশবন্ধুকে একবার স্পর্শ করিল। তৎপরে ৭—৪৫ মিনিটে ধীরে ধীরে দেশবন্ধুর শব হ্যারিসন রোড ধরিয়া বিপুল জনতা ঠেলিয়া শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথমেই কলিকাতা কর্পোরেশনের জলপূর্ণ গাড়ি রাস্তায় জলসেচন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তৎপশ্চাতে জাতীয় পতাকাবাহীদল তৎপরে বজরং পরিষদ কর্ত্তৃক বরফ মিশ্রিত সুশীতল পানীয় জলের লরী, তাহার পশ্চাতে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সংকীর্ত্তনের দল অগ্রসর হইতে লাগিল, ইহার পশ্চাতে বয়-স্কাউটস্। তাহার পর আর এক গাড়ি হইতে খৈ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে তাহার পর পুনরায় দলে দলে খোল করতাল সংযোগে হরিসংকীর্ত্তন। তাহার পশ্চাতে সুদীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিহিত আকালীদল। তাহার পর আবার হক সাহেবের বাজারের পুষ্পবিক্রেতা-বর্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কুসুমদামে রচিত সুদৃশ্য তোরণ। তদুপরি কুসুমাক্ষরে লিখিত ছিল "একতাই পথ।" পুনরায় পুষ্পপল্লবে রচিত পতাকা, তাহার একদিকে বন্দেমাতম্ লিখিত, অপরদিকে ত্রিবর্ণে অঙ্কিত জাতীয় পতাকা। তাহার পশ্চাতে আর একটী বৃহৎ তোরণ— তাহাতে বড় বড় অক্ষরে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" লিখিত। তৎপশ্চাতে নেতৃবৃন্দ ও অগ্রে পশ্চাতে ২ লক্ষ আন্দাজ শোকার্ত্ত পরিশোভিত হইয়া আর্ত্তজন শববাহক কর্ত্তৃক শব লইয়া মন্থর-গতিতে বিপুল জনস্রোতের ভিতর দিয়া শব লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড দিয়া মাড়োয়ারী হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া চিৎপুর রোড মেছুয়াবাজারে প্রবেশ করে। সেখান হইতে কলেজ ষ্ট্রীট পড়িয়া দক্ষিণে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শোভাযাত্রীবর্গ কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেখান হইতে শোভাযাত্রা পুনরায় অগ্রসর হইয়া ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট ধরিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে পড়িয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মিছিল কর্পোরেশন অপিসের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কলিকাতার প্রথম মেয়র অক্লান্তকর্ম্মী দেশবন্ধু-দাশের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য আপিসের সম্মুখে ডেপুটি মেয়র, অস্থায়ী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমস্ত কাউন্সিলারবর্গ ও মহিলা কাউন্সিলার মিস লয়েড উপস্থিত হয়েন। ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের শ্রদ্ধান্বিত মেয়রের প্রতি শেষ সম্মান স্বরূপ টুপী খুলিয়া শোকাশ্রু নয়নে মৃত দেহের উপর পুষ্পদান করেন। অপরাপর ছোট বড় কর্ম্মচারিবৃন্দ সাশ্রুনয়নে কম্পিতপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের শেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এম্পায়ার থিয়েটার ও গ্রাণ্ড হোটেল ও অপরাপর গৃহের গবাক্ষ ও ছাদ হইতে ইউরোপীয় নরনারীবর্গ সসম্মানে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাঁহারা দেশভক্ত বীরের জাতি, এই বাঙ্গালী দেশভক্তের প্রতি তাঁহারাও মাথার টুপী উত্তোলন করিয়া ও পুষ্প বৃষ্টি করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্রমে মিছিল চৌরঙ্গী রোড ধরিয়া ভবানীপুরে দেশবন্ধুর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। আর্ম্মি ও নেভী ষ্টোর্সের পতাকা অর্দ্ধ নমিত অবস্থায় রাখা হয়। এখান হইতে মোটরে করিয়া বহু ইউরোপীয় নরনারী শবের অনুগমন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকেন। শিয়ালদহ হইতে পথিমধ্যে সর্ব্বত্রই শোভাযাত্রীর মধ্যে পাখা বিতরিত হয়, পুরনারী পুষ্প

ও খৈ ছড়ান এবং শঙ্খধ্বনি করেন। অনেকে অর্থও বিতরণ করেন।

দেশবন্ধু দাশ দেশের কাজে তাঁহার সম্পত্তির সহিত বসতবাটীও দান করিয়া গিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার শব সে গৃহে না লইয়া রাস্তায় স্থাপন করা হয়। সমবেত মহিলাদের দেখা শেষ হইলে হাজরা রোড ধরিয়া কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্মশানে পূর্ব্বেই দেশবন্ধুর আত্মীয় স্বজন ও বহু পুরমহিলা ও ২ লক্ষ আন্দাজ বিশাল জনসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে শব কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে নীত হইল। তখন বেলা প্রায় আড়াইটা।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য একমণ ঘৃত, ১০ মণ চন্দন কাষ্ঠ আনীত হয়। যথাসময়ে চিতা সজ্জিত হইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। যতক্ষণ না শব দাহ শেষ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও সমবেত জনতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে যে স্থানে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ দাহ করা হইয়াছিল, সেইস্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। দেশবাসী এবং কলিকাতা কর্পোরেশন এজন্য অর্থসাহায্য ও বৃহৎ একখণ্ড জমি দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতি বৎসর দেশবন্ধুর মৃত্যু দিবসে তথায় বহু স্বদেশভক্ত নরনারী সমবেত হইয়া পরলোকগত বীরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন।

করুণাময় ভগবান আমাদের ঘরে ঘরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় দেশভক্ত সন্তান দান করুন ইহাই প্রার্থনা।

পরিশিষ্ট

কেন বাংলাদেশের অন্তর বিদ্রোহী হয় ?

মিষ্টার রামজে ম্যাকডোনাল্ড কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক দাবীর যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের উপর যে ঘোর অবিচার করা হইয়াছে, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। বাঙ্গালার অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিষ্টার জে, এন্, গুপ্তও সে-কথা সকলকে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই রোয়দাদের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় স্বার্থের যে বিশেষ হানি হইবে এবং ভবিষ্যতে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা যে ঘোর অসন্তোষজনক হইবে, সম্প্রতি সে বিষয়ও তিনি অকাট্য যুক্তি সহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, এই রোয়দাদ বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক বিবাদ এবং হিংসাকে স্থায়ী করিবে, কেবল তাহাই নহে, উহার ফলে ঐ বিবাদের ও ঈর্ষার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গালার যে হিন্দুগণ সমস্ত ভারতের রাজনীতিক মুক্তি আন্দোলনের নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছেন এবং যাহার ফলে বাঙ্গালাদেশ বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই হিন্দুগণ যে ইহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবে, ইহা মনে হয় না। মিষ্টার গুপ্ত বলিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী মহাশয় মনে করিয়াছেন যে, এই রোয়দাদের ফলে সকল সম্প্রদায় সহযোগিতা পূর্ব্বক সংস্কৃত শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবে। ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এ কথা বলিলে একটা বিরাট উপহাস করা হয়। কোন রাজনীতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুতেই এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন

না। দেশের মধ্যে যে সকল সম্প্রদায় সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ এবং অভিজ্ঞতাবর্জ্জিত তাহাদিগকে লইয়া একটা কৃত্রিম ও স্থায়ী সংখ্যাধিক সম্প্রদায় গঠিত করার ফলে যে কেবলমাত্র কোন মূল মতের উপর বিন্যস্ত দল গঠন ও জাতীয় আশা পূর্ণ করা কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে তাহা নহে, অধিকন্তু উহার ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, তাহার ফলে নূতন শাসনযন্ত্র পরিচালন করিয়া সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে না। গুপ্ত মহাশয়ের এই কথাগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গত ৯ই জুন তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় গুপ্ত মহাশয় তাঁহার এই সম্বন্ধে শেষ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। আমরা সকলকে ঐ সন্দর্ভটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সকলেই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের চুক্তির কথা (minority pact) শুনিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার ভাগ্যে এখন অতি বড় সংখ্যাধিক সম্প্রদায়গুলির চুক্তিই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ্যভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে প্রভাবিত মুসলমানদিগের সহিত তাহাদেরই অনুবর্ত্তী তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের অপবিত্র সম্মেলন ঘটিল। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানগণ ১১৯ জন আর ৯ জন, একুনে ১ শত ২৮ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে সমর্থ হইবেন, আর তাহার সহিত পুণা চুক্তি অনুসারে ৩০ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্য মিলিত হইবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যবস্থাপক সভায় ২ শত ৫০ জন সদস্য থাকিবেন, সেই ব্যবস্থাপক সভায় এই সম্মিলিত পশ্চাৎপর সম্প্রদায়ের সদস্য হইবে ১ শত ৫৮ জন। ইহা কোন্

রাজনৈতিক মূলসূত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা, তাহা সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া বিদিত মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডই বলিতে পারেন। কোন সম্প্রদায়ের আত্মাভিমানকে আহত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে সত্যের অনুরোধে এ প্রশ্ন অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যে সকল কারণে বাঙ্গালা, প্রদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অগ্রণী ও ঈর্ষা-ভাজন হইয়াছে, সেই সকল কারণের কতকগুলি কারণে এই সম্মিলিত এবং সংখ্যায় অত্যধিক দল পুষ্টি সাধন করিয়াছেন? জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, রাজ-নীতিক সন্দর্ভ রচনায়, দর্শনে, সাহিত্যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন্ বিষয়ে এই সাহায্যপুষ্ট সম্মিলিত দল বাঙ্গালার প্রগতি সাধনে সাহায্য ও সহায়তা করিয়াছে? বাঙ্গালায় প্রকৃত অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত কোন জাতি নাই বলিলেও চলে। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষকে বাঙ্গালায় অস্পৃশ্যতারূপ মানদণ্ড ছাড়িয়া হিন্দু-সমাজভুক্ত কতকগুলি জাতিকে তাঁহাদের আপনাদের খোস খেয়াল অনুসারে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকেই ৩০টি 'স্বজাতীয়' সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই তালিকাভুক্ত জাতিদিগের মধ্যে এইমাত্র সমতা বা তুল্যতা লক্ষিত হয় যে তাহারা জ্ঞানের রাজ্যে প্রগতিহীন,—অর্থাৎ পশ্চাৎপদ।

মিষ্টার গুপ্ত সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পুস্তক হইতে হিসাব তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রগতিসূচক সকল বিষয়েই বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা লিখিতে এবং পড়িতে জানে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৬৪ জনের অধিক হিন্দু আর সাড়ে ৩৩ জন মুসলমান। আর যত বাঙ্গালী ইংরাজী

জানে, তাহার মধ্যে হিন্দুর আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা সাড়ে ৬৯ জনের অধিক, আর মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৫ জনেরও ন্যূন। উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা কিছু কম ১৮ জন আর হিন্দু ছাত্রদিগের সংখ্যা শতকরা সাড়ে ৭৯ জনেরও উপর। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা সাড়ে ১৩ জনের কিছু অধিক আর হিন্দুদিগের সংখ্যা শতকরা সাড়ে ৮৩ জনের কিছু উপর। ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১৪ জনের কিছু উপর, হিন্দুদিগের সংখ্যা ৮৩ জনের কিছু কম। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও রিসার্চ্চ শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্র শতকরা ১৩ জন আর হিন্দু ছাত্র শতকরা সাড়ে ৮৫ জন। ব্যবসায় বাণিজ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা ৮ জনেরও কম আর হিন্দুর সংখ্যা সাড়ে ৮৬ জনের অধিক। ব্যাঙ্ক, বাট্টা এবং বীমার কাজ যাহারা করে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫ জন মুসলমান, আর হিন্দু কিছু কম সাড়ে ৮৩ জন। চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা প্রায় ১৮ জন আর হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০ জন; আইন-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে মুসলমমান শতকরা সাড়ে ১১ জন এবং হিন্দু সাড়ে ৮৭ জনের কিছু অধিক। সরকারের নিকট যত রাজস্ব দেওয়া হয় তাহার শতকরা ২০ ভাগ দেয় মুসলমান আর ৮০ ভাগ দেয় হিন্দু। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কোথায় যে তাহাদিগের জন্য আইন করিয়া গণতন্ত্রবাদের মূল সূত্রে পদাঘাত পূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাধিক সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার প্রদত্ত

হইয়াছে? মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাহারা এরূপ পশ্চাৎপদ কেন?

সাইমন কমিশনও স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় মুসলমান সম্প্রদায়কে আইন দ্বারা সংখ্যায় অধিক সদস্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করা অসঙ্গত। কিন্তু তাহা হইলেও মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড আইন দ্বারাই মুসলমানদিগকে ব্যবস্থা পরিষদে স্থায়ী সংখ্যাধিক্য দিবার জন্য ফতোয়া দিলেন কি কারণে? এ কথা সত্য যে, গত দশ বৎসরে মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, প্রজনন কার্য্যে যে সম্প্রদায় যত অধিক তৎপর, রাজনীতিক্ষেত্রে সেই সম্প্রদায় মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মতে অধিক অধিকার প্রাপ্তির দাবী করিতে পারে? সকলেই জানে যে, পশ্চাৎপদ জাতিদিগের সন্তান অধিক জন্মে। যুক্তপ্রদেশের সেন্সাস কমিশনার সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে কি বুঝিতে হইবে, সরকার প্রধানতঃ পশ্চাৎপদ জাতিদিগকে লইয়া ভবিষ্যৎ শাসনযন্ত্র চালাইতে চাহেন? ইহাই কি গণতন্ত্রের মূল সূত্র? হায় মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড! তোমার যে শেষটা এইরূপ মতিভ্রম হইবে, তাহা আমরা মনে করি নাই। যে হিন্দুরা ইংরাজ জাতিকে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার সহায়তা করিয়াছেন, সেই হিন্দুরা আজ কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত অধিকার চাহিতেছে বলিয়া তাহারা সাম্রাজ্য-বাদীদিগের বিষ নজরে পতিত হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদীদিগের কি এমনই কুহক যে, সমাজতন্ত্রবাদী মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া এইরূপ দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছেন?

মিষ্টার গুপ্ত বলিয়াছেন যে, এই সঙ্কটকালে বাঙ্গালার বিপ্লববাদীরা আবির্ভূত হইয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা বিলাতী প্রতিক্রিয়াশীল দলের হস্ত দৃঢ় করিয়া দিয়াছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। একথা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু একথাও সত্য, ইহা বিপ্লববাদীদিগের দমনের পক্ষে একটা পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ন্যায়-ধর্ম্ম দ্বারা চালিত হইলে তবে লোকের মনে প্রীতির সঞ্চার হইবে এবং বিপ্লববাদীরা দমিত হইবে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, সাম্প্রদায়িকতার উপর যদি শাসন-সংস্কার রচিত হয়, তাহা হইলে তাহা কখনই সুফল প্রসব করিবে না। ডাক্তার আলম যথার্থই বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার বিরোধী এবং জাতীয়তাও সাম্প্রদায়িকার বিরোধী। লক্ষ্ণৌ-প্যাক্টে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহাই এখন ফলপুষ্প-শোভিত মহাতরুতে পরিণত হইয়াছে,—একথা আমরা বহুবারই বলিতেছি। আজ ডাক্তার আলমও সেই কথা বলিতেছেন। সেই জন্য আমরা পুণা প্যাক্টেরও সমর্থন করি না। পণ্ডিত মদনমোহন কেন এমন ভুল করিলেন, তাহা আমরা বুঝি না; কিন্তু ভুল হইলে তাহার সংশোধন করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই করা কর্ত্তব্য।

২৭. ২. ৪০.

বাংলার যুবকগণ, বিপ্লববাদ ও পুলিশ

পূর্ণ দেশাত্মবোধে যে সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ দেশ সেবায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যে উচ্চ আদর্শের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আজ যদি বাংলার তরুণের দল সেই আদর্শের পন্থী হইয়া নিজেদের গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে দেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজ বাংলার নব্য সম্প্রদায় সেই মহান আদর্শ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কোথায় আজ তাঁহারা আদর্শ স্থানীয় হইয়া জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল করিবেন, না, আজ তাঁহারা বিপ্লবী, তাঁহারা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হত্যা করিয়া দেশ স্বাধীন করিবেন, কি ভীষণ দুঃসাহসীকতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয়! আবার এইরূপ নৃশংস ও অমানুষিক হত্যাকাণ্ডগুলিকে দেশের জননায়কগণ ও সংবাদপত্রগুলি বেশ বাহবা দিয়া ও সভাসমিতির দ্বারা হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়া চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনও আলীপুরের সুযোগ্য প্রবীণ সিভিলিয়ান মিঃ গার্লিকের

হত্যাকাণ্ডে এমনভাবেই প্রশংসা করিয়াছিলেন। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র সাবধান করিয়া দেন।

দেশবন্ধু প্রমুখ বহু দেশনেতাই সিরাজগঞ্জে বিরাটসভা করিয়া হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার হত্যার নিন্দা ও ভ্রান্তপথে দেশসেবার জন্য কিছু বলিয়া বীরত্বের প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সমস্ত ঘটনায় দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও ক্রমশঃ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কঠোর হস্তে দেশ শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দেশের জননায়কগণ ও সংবাদপত্রগুলি এইরূপ বিপ্লবী যুবকদিগকে বীর বলিয়া চারিদিকে ঘোষণা করিবার সময় তাঁহারা কি একবারও একটু স্থির মস্তিকে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা দেশের কতদূর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে? আজ যে সমস্ত বিপ্লবীরা এইরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তান ও কতিপয় ধনী সন্তান। তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের বহু অংশ ভাতা, সুখসাচ্ছন্দ, চিকিৎসা, পাঠাগার, সংবাদপত্র, পূজা, পাঠাভ্যাস প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতে হইতেছে। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য রাজস্বের বিরাট অংশ গভর্ণমেণ্টকে ব্যয় করিতে হইতেছে। যে দেশে, দিনের পর দিন বেকার সমস্যা ভীষণ হইতে ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছে, কত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না,

তাঁহাদের কথা কয়জন চিন্তা করিয়া থাকেন? বীরত্বের প্রতিদানের বিনিময়ে রাজস্বের বহু অংশ বিপ্লবী শাসনে ব্যয় হইতেছে। মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি দেশগুলি বাংলার বুকে বাস্তবিকই অভিশপ্ত দেশ! এই সমস্ত দেশগুলিই ঐ পাশবিক অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র। মেদিনীপুরে যেমন সুনিপুণ ও কর্ম্মদক্ষ পেডি হইতে আরম্ভ করিয়া বার্জ পর্য্যন্ত তিন তিনজন কার্য্যক্ষম ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবলীলাক্রমে অত্যন্ত পৈশাচিকরূপে হত্যা করা হইয়াছে। ইঁহাদের সুশাসনের কথা আজ সকলের কাছেই শুনিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুরে যখন পুলিশের সঙ্গে বিদ্রোহী প্রজাদের দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই সময় মিঃ পেডি বহু জনহিতকর কাজ মালদহে করিয়া জনপ্রিয় হন ও মেদিনীপুরে বদলী হইয়া আসিলেন। আমার ছোট ভাই বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে কাজ করে, সে বলে "পেডি, ডুর্নো প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে আমি কাজ করিয়াছি। এঁরা যেমন কর্ম্মদক্ষ তেমনি মহৎ হৃদয় ও দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এঁদের অভাবে দেশের ও শাসন কার্য্যের যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ কিছুতেই হইবার নহে।" বাংলাদেশে যত নারীহরণ ও ধর্ষণ হয় তাহার প্রতিকারের জন্য মিঃ সিমসন দেশের প্রত্যেক থানা হইতে রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বিনিময়ে তিনিও প্রাণ দিলেন। চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য সেখানে এমনই কড়া শাসনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে যে, সে দেশের কত নিরপরাধী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত বিনাদোষে শাস্তি ভোগ করিয়াছেন, মেদিনীপুরেও তাহাই। দার্জ্জিলিং বাংলার একমাত্র মনোরম স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, সেখানে বাংলার

বর্ত্তমান সদাশয় গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারশনের পর্য্যন্ত প্রাণ গ্রহণের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু ভগবানের শুভ ইচ্ছায় তিনি সেই শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। শয়তানের চরমদণ্ডের আদেশ হয়। সে প্রাণরক্ষার্থ হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল ও সর্ব্বত্র আবেদন করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলে সহৃদয় গভর্ণরই তাহাকে ক্ষমা করিলেন! যে তাঁহার প্রাণ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল তাহাকে ক্ষমা করিলেন! পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ যে কোন লোকই নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বা উচ্চতম হিমালয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য অবাধ গতিতে যাতায়াত করিতে পারিতেন কিন্তু এখন ছাড়পত্রের জন্য অনেকেরই পক্ষে সে সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। অথচ বিপ্লববাদীদের মঙ্গলের জন্য মাননীয় গভর্ণর সার জন এণ্ডার্শন যে খুবই চিন্তা করিয়া থাকেন তাহারই পরিকল্পনা হইতেছে বিপ্লবীদের শিল্প ও কৃষি শিক্ষাদান করা। তৎপরে তাঁহাদের মূলধন দিয়া ব্যবসা করিয়া দিয়া উৎপন্ন শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য সরকারই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাদের ন্যায় গৃহস্থদের পক্ষে বেকার সন্তানদের এ সুযোগ সুবিধাদানের অবসর ও সৌভাগ্য উপস্থিত হয় কি? ইঁহার যত্ন ও চেষ্টায় কর্ত্তৃপক্ষবর্গ জেলায় জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিল্প শিক্ষাদান করিতেছেন। দেশের নেতারা ও কংগ্রেসদল এসম্বন্ধে কতটা কি করিতেছেন? শুধু দলাদলি, ক্ষমতা-অধিকার ছাড়া অপর কোনও কাজ ত তাঁদের দেখিতে পাই না। সিমসন, লোম্যান, পেডী, বার্জ্জ, গার্লিক, ষ্টিফেনসন, ডুর্নো, প্রভৃতি সুযোগ্য ও কর্ম্মদক্ষ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া বা হরণ করিতে চেষ্টা করিয়া দুরাত্মা বিপ্লবী তরুণের দল তাহাদের দুর্ব্বলতার ও ভীরুতার এবং

বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠ দেখাইয়াছে। ইহাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, যেমন আর্থিক তেমনি শাসন ব্যাপারে। বিপ্লবীদের দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত গোয়েন্দা, পুলিশ ও সৈন্যের (Special Police Force) ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। শাসনের দিক দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেশে এমন অবস্থায় শান্তি রক্ষার্থে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া পুলিশ বিভাগকে যথেষ্ট শক্তি দিতে হইয়াছে। একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পুলিশ শান্তিরক্ষার্থে দেশের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয়। মনে করুন দেশ হইতে যতগুলি Police Station বা থানা আছে তাহা হইতে যদি কতকগুলি কমান যায়. তাহা হইলে যে যে অঞ্চল হইতে সেই সমস্ত থানাগুলি তুলিয়া দেওয়া হইল সে সকল স্থানের লোকেরা কি সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারে? আবার যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হয় তখন ঐ লাল পাগড়ী পুলিশদেরই নিকট ছুটিয়া যাইতে হয়। তাহা হইলে পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে দেশে সাধারণ শান্তি রক্ষা করিতে হইলে পুলিশের কত প্রয়োজন।

দেশের সাধারণ শান্তির ভার পুলিশের হাতেই রহিয়াছে কিন্তু অনেক সময়ই আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগের কথা শুনিতে পাই এমন কি আলীপুর জেলে সুভাষচন্দ্রের হাতভাঙ্গা, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন হইতে বর্ত্তমান চিকিৎসাক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার এন, কে, রায়ের সুযোগ্য পুত্র ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র রায় এম-বির মত ব্যক্তিও পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিকবার গুরু অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। অবশ্য এ স্থলে

আর একটা কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক সময় আমরা কার্য্যবশতঃ পুলিশের ছোট বড় বহু রকম কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছি, তখন কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে ভদ্রোচিত ব্যবহারই পাইয়াছি, সুতরাং এরূপ স্থলে কিজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায় সে কথাও একটা ভাবিবার বিষয়, এ সমস্যার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে মনে হয় যে ইহার পশ্চাতে ব্যক্তিগত জেদ (way-wardness) বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু আমাদের সততই মনে রাখা উচিত যে হিংসামূলক জেদ উভয়পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে সুতরাং এই প্রকার জেদের হাত হইতে যাহাতে আমরা সাবধান হইয়া চলিতে পারি তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

আর মাত্র দুই একটী কথায় আমরা এই গ্রন্থ শেষ করিব। কাহারও আত্মসম্মান গ্রহণ করা বা গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিৎ নয়—এই উভয় ব্যাপারেই পাপ হয়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পরস্পরের আত্মসম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা উচিত। জেলে অবরুদ্ধ ভদ্রসন্তানগণের কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের আর একটা কথা মনে হয়—উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ জেল কর্ম্মচারী এবং ঐ ব্যাপার সংলগ্ন রাজকর্ম্মচারিদিগের আচরণের কথা, যে সমস্ত ভদ্রসন্তানগণ দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা সকল সময়ই জেলসংক্রান্ত আইন কানুন মানিয়া চলেন ইহাই বিনীত অনুরোধ। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে রুগ্না স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যে

কয়েকবার জেল হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারাও আবার যথা সময়ে কারাগারে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই নিয়ম ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ জেলে আবদ্ধ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের প্রতি কতকগুলি আত্মসম্মান হানিকর জঘন্ত আচরণের অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে,—যেমন জোড়ায় জোড়ায়, তাঁহাদের দাঁড় করাইয়া "উঠ বস" করানো, "সাহেব সেলাম, সাহেব সেলাম" বলানো ইত্যাদি। যাঁহারা এই সমস্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন তাঁহারা তো পুরোদস্তুর আত্মসম্মানজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি; তাঁহারা কি জানেন না যে এই প্রকার করাতে ঐ সমস্ত ভদ্রসন্তানদের আত্মসম্মানের উপর আঘাত করা হয়। সেই সঙ্গে দেশের রাজভক্ত আপামর সাধারণ সকলেরই অন্তর বিদ্রোহী হয়। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মনুষ্যত্বের কতকগুলি সাধারণ সূত্রের কথা মানিয়া চলা উচিত। আবার অনেক সময়ে আমরা উক্ত অবরুদ্ধ ভদ্রসন্তানগণের খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনেক আপত্তিজনক কথা শুনিতে পাই। বাস্তবিক তাঁহাদের খাদ্যাদি দেওয়া ব্যাপারেও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিৎ, তাঁহাদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে, ঐ রাজকর্ম্মচারিগণের অতর্কিতভাবে খাদ্য পরিদর্শন করা কি উচিৎ নয়? এইরূপ ভাবে উভয়ে উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে শৃঙ্খলা আপনিই বজায় থাকিবে।

শেষ

১। মুচি—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া ২৲
২। রুদ্রকান্ত— ঐ ২৲
৩। থিয়েটার দেখা ঐ ২৲
৪। সতী-অসতী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৲
৫। বিধবার কথা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৲
৬। পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী—শ্রীপরাগরঞ্জন দে ১৷৹
৭। অপরাধের জের—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৲
৮। মুখোমুখি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৲
৯। নিশিরডাক—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৲
১০। বিনোদ-হালদার—(নূতন উপন্যাস) ঐ ২৲
১১। শূন্যতার প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ২৲
১২। বন্ধুর দান—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲
১৩। সংসার পথের-যাত্রী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৷৹
১৪। মডেল সতী—শ্রীমেঘনাথ শর্ম্মা ২৲
১৫। বায়ুবহে পুরবৈয়াঁ—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲
১৬। বন্ধুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১৷৹
১৭। কুঞ্জ-মন্দির—২য় সংস্করণ শ্রীমতী বনলতা দেবী ১৷৹
১৮। অপরাধী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৷৹
৯। মানরক্ষা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৲
২০। ভবঘুরে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১।৹
২১। কর্ম্মভোগ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৲
২২। ডিক্রীজারী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৷৹
২৩। নবাব—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৷৹
২৪। রসকলি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ২৲
২৫। ভোরের পূরবী—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ১।৹
২৬। সুচরিতা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ১৷৹
২৭। মুক্তিস্নান—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲
২৮। দোটানা—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৷৹
২৯। মনীষা—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ২৲
৩০। অভিনেত্রীর একরাত্রি—ঐ ২৲
৩১। গৃহলক্ষ্মী—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৸৹
৩২। লণ্ডন-কাহিনী—২য় সং শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি ২৲
৩৩। পুণ্যের জয়—৪র্থ সং শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি ১৲
৩৪। দিগন্ত—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৸৹
। ঝঞ্ঝাহত বনস্পতি—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲

মাছ সিদ্ধ ; দৈ মাছ, কুমড়ার নানাবিধ পায়স, কাঁচা (অপক্ক) কলার রুটি, মানকচুর রুটী ও পায়স, চিংড়িমাছের কাটলেট, চিংড়ীমাছ পোড়া, ইলিশমাছ ভাতে ও সিদ্ধ, মাছের কোপ্তা, মাছের দম, নিরামিষ পোলাও, ছানার দধি পলান্ন, পোঁলাও, আনারসের পোলাও, ফুলকপির পোলাও, মাছের পোলাও, মাংসের পোলাও, চিতলমাছের কোপ্তা, মাছের পুরী, মাছের ঝুরিভাজা, গল্‌দাচিংড়ির রসবড়া, চিংড়িমাছের সহিত বুটের ডাল, তেল ঝোল, ছেঁচড়া, ডিমের প্রলেহ, ডিমের মলিদা, ডিমের মোহনভোগ, ডিম্বামৃত, ডিমের কাটলেট, ডিমের বড়া, ডিমের পুরী ও ডিমের মধুরান্ন, মাংস প্রকরণ, পাঁঠার কারি বা ঝোল, মাংসের ভর্ত্তা, মাংসের কোপ্তা ও মাংসের অম্ল, মাংসের কাটলেট ও চপ, মাংসের রোষ্ট, মাংসের গেরেল, আনারসের চাটনি, আলুর চাটনি, পুদিনা শাকের চাটনি, আলুবখরার চাটনি, পায়স, ফুলকো লুচি, খাস্তার লুচি, ও কচুরী, বড় কচুরী ও সিঙ্গেড়া প্রস্তুতপ্রণালী, পাঁপর ভাজিবার প্রণালী, ও ঝালবড়া প্রস্তুত, নিম্‌কি, পাটনাই নিম্‌কি, গজা ও বালুসাই প্রস্তুতপ্রণালী, বঁদে ও মিঠাই প্রস্তুত, মিহিদানা, জিলাপী, অমৃতি, ছানাবড়া, ছানার মালপোয়া ও রসমাধুরী প্রস্তুত প্রণালী, নিখুঁতি কবণ, খাজা প্রস্তুত-প্রণালী, মুগের বরফি, গোলাপী চন্দ্রপুলী, মাড়োয়ারী হালুয়া, কমলালেবুর বরফি, ক্ষীরের গুজিয়া, ক্ষীরের বরফি, গোলাপী চম্‌চম্, ক্ষীরের আপেল ক্ষীরের লুচি, চন্দ্রমাছ, চন্দ্রানন, খৈচুর, সরপুরিয়া, রসবড়া, রসগোল্লা ক্ষীরমোহন, লেডিক্যানি, চম্‌চম্ প্রস্তুতপ্রণালী, ক্ষীরের মনোরঞ্জন, ক্ষীরের ছাঁচ, তাল ক্ষীর, বরফি, গোলাপী রসগোল্লা, পাকা আমের বঁদে ও কুমড়ার মেঠাই, সীতাভোগ, ছানার মুড়কি ও ছানার পায়স, ছানার মালপোয়া, কিস্‌মিসের মোহন ভোগ, রাবড়ী, খাসা মোণ্ডা, ও কস্তুরো সন্দেশ, নূতন গুড়ের সন্দেশ, তালশাঁস সন্দেশ, আম সন্দেশ, সর চূর্ণ, ক্ষীরের পানতুয়া, পেস্তার বরফি, খেজুর রসের পায়স ও বঁদের পায়স, মানকচুর রুটী ও পায়স, চিড়ার পিঠা, ভাজা মুগের বরফি ও পিঠা, গোকুল পিঠা এবং কলার পিঠা, গোপালভোগ পিঠা, পরিশিষ্ট নানাবিধ পুডিং মোরব্বা, নানাবিধ জেম জেলী, চাট্‌নী, সাগু এরারোট ও মানমণ্ড, খৈ ও যবের মণ্ড ও সুজির রুটী, মাংসের জুস, কুলের আচার ও বেগুনের আচার, তেঁতুল, কুল, আমড়া, লেবু আদা প্রভৃতির আচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্ম-সমাজ

শ্রীমতী বনলতা দেবী তদীয় দাদাশ্বশুরের এই জীবনচরিতখানি লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ১০০ বৎসরের পূর্ব্বকার ব্রাহ্ম সমাজের ও ব্রাহ্মদিগের বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা ৫০ বছর পূর্ব্ব লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল কিম্বা আর কিছুকাল পরে সংগ্রহ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব হয় ত হইয়া পড়িত। "প্রাণনাথ মল্লিকের চেষ্টা যত্ন ও উদ্যোগে ইঁহার জ্ঞাতি ও স্বজন মিলিয়া প্রায় ১০০ ঘর বাগআঁচড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।" তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে মহান্ উপকার ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে উপনয়ন সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ৺প্রাণনাথ মল্লিকই ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের ও বেদীতে বসিয়া অব্রাহ্মণের পক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করার অধিকার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন ও বিপ্লব আনয়ন করেন। স্ত্রীস্বাধীনতা ও ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগদান এবং প্রকাশ্যে চলাফেরা তাঁর বাটীর মেয়েরাই সর্ব্বপ্রথম করেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তিনিই। প্রবত্তকে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ষষ্টমবর্ষ ২য় সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—'বাগআঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। * * * 'প্রাণনাথ মল্লিক একজন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলেন "উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ * * * কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন?" * * * কথাটা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি, সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজ অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" ইহার পরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করিলেন। উপবীতধারী আচার্য্যের ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রহ্মোপাসনা বা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে অমনি তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে এই কথা লিখিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিবাদ পত্রে গোঁসাই কেশবচন্দ্রকে ইহাও জানাইলেন যে, যদি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" কেশবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়ের মতের অনুমোদন করিয়া * * * গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে সমাজের আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইল।" (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, সদগুরুসঙ্গ, বিজয় কথামৃত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

এই বহিতে সেকালের বহু ঘটনার সঙ্গে প্রবীণ লেখক লেখিকাদের লিখিত অনেক প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে, যেমন :—প্রাণনাথ মল্লিকের পুত্র রজনীকান্ত মল্লিক সম্বন্ধে